আল-কোরআনের দৃষ্টিতে

ইবাদাতের সঠিক অর্থ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আল কোরআনের দৃষ্টিতে

ইবাদাতের সঠিক অর্থ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৪ জুলাই

প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১২৭৬৪৭৯

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ৬০/- টাকা

Al Quraner Dristite Eabadater Showtik Ortho
Moulana Delawar Hossain Sayedee

Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul

Published by Global publishing Network, Dhaka.
First Edition 2004 July

যা বলতে চেয়েছি

বর্তমানে ইবাদাত শব্দের ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তারাও এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে বলে, তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করছে না।

সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির করা, তস্‌বীহ্‌ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামাজ আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ূ লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে

শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না।

নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কতটা ভুল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করলে তাদেরকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করা হবে। পৃথিবীকে শাসন করবে তারা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। অথচ আমরা দেখছি, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করছে অর্থাৎ তারা নামাজ আদায় করছে, রোজা পালন করছে কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করা তো দূরের বিষয়–গোটা পৃথিবীব্যাপী তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে।

এই পৃথিবীতে একটি কুকুর-বিড়ালের যে মূল্য রয়েছে, সে মূল্য মুসলমানদের নেই। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি অসত্য? মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত করছে–তাদের এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অসত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহলে মুসলমানদের দাবী মিথ্যা বলে বিবেচনা করতে হয়। কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইবাদাত শব্দের সঠিক অর্থ বুঝে এবং সেই অনুসারে আমাদের জীবন পরিচালনার তওফিক এনায়েত করুন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

৯১৪ শহীদবাগ, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্‌সীর

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি

কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল আসর, সূরা লুকমান, আমপারা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ

আল কোরআনের মানদন্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা

দ্বীনে হক-এর প্রতি দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

আল কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান

মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন

বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন-১ ও ২

শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২

আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মোনাজাত

আল্লাহ কোথায় আছেন?

ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক

মানুষ জানে না, কে সে? কোথেকে তার আগমন? কোথায় তাকে পুনরায় যেতে হবে? এই পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? কে তার মনিব? সে কার দাসত্ব করবে? এসব প্রশ্নের জবাব মানুষের জানা নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাঁর নবীর মাধ্যমে মানব মনের এসব স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক হলো মুনিব এবং গোলামের সম্পর্ক। মানুষ আল্লাহর গোলাম–এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়, এই পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তুমি তোমার পরিচয় এভাবে পেশ করো–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ–

আমরা কেবল তোমরাই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

অর্থাৎ সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী তুমি, তোমার একান্ত অনুগ্রহেই তুমি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমাদের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ তুমিই প্রতি মুহূর্তে সরবরাহ করছো। তুমিই আমাদের রব–তুমি আমাদের মনিব, আমাদের ইলাহ–আমাদের মাবুদ, তুমিই আমাদের শাসক। তুমিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছো, আমরা তোমারই গোলাম। আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি। কেননা, তুমি ব্যতীত সাহায্য করার কেউ নেই। আমরা অপারগ, আমরা শক্তিহীন, দুর্বল, অসহায়, তোমারই মুখাপেক্ষী। তুমি মহীয়ান, গরীয়ান, সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের মনিব এবং আমরা তোমার গোলাম–এ কারণে আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাবতীয় ব্যাপারে আমরা তোমারই মুখাপেক্ষী। আর এটাই হলো আমাদের পরিচয়। বান্দাহ্ এভাবে তাঁর মনিবের কাছে নিজের পরিচয় পেশ করলো, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' পরিচয়টা এভাবে দেয়া হলো না যে, 'আমরা তোমার দাসত্ব করি।' পরিচয় পেশ করা হলো এভাবে যে, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।' তোমার -শব্দটির সাথে 'ই' যোগ করে 'তোমারই' শব্দ ব্যবহার করে একথাই দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হলো যে,

আমরা অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করি না, আমরা শুধু তোমরাই গোলামী করি এবং যে কোন প্রয়োজনে আমরা তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ এই কথাটি উচ্চারণ করে সে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিয়ে দিল, সে অন্য কোন শক্তির আইন মানে না। সে দেশ, জাতি ও সামাজের প্রচলিত কোন প্রথা, পূর্ব পুরুষ কর্তৃক প্রচলিত কোন প্রথা, মানুষের বানানো কোন আইন সে মানে না। কারো বানানো কোন আইনের কাছে সে মাথানত করে না। সে একমাত্র মাথানত করে মহান আল্লাহর বিধানের কাছে। এ কথার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আল্লাহর বিধানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করলো এবং নিজেকে আল্লাহর দাস বলে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের পরিচয় পেশ করলো।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, অনন্ত অসীম মহাশক্তিধর কল্পনাতীত গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহর কাছে ক্ষুদ্র এই মানুষের অবস্থান কোথায়? মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজের যে শক্তি ও গুণাবলীর পরিচয় পেশ করেছেন, এর প্ররিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে মানুষকে কোন ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে? মানুষ সেই আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একজন মহাবিজ্ঞানী কুশলী স্রষ্টা মান্য করবে না তাঁকে মানুষ নিজের গোটা জীবনের দাসত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী মাবুদ, আইনদাতা, বিধানদাতা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌম প্রভু বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই অবতীর্ণ করা জীবন বিধান অনুসরণ করবে? আল্লাহর প্রশংসা পর্ব শেষ করার পর পরই এ ধরনের নানা প্রশ্ন এসে মানুষের মনকে দোলায়িত করতে থাকে। এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর লাভ না করা পর্যন্ত মানুষের অনুসন্ধানী মন কোন ক্রমেই স্থির হয় না বা হতে পারে না।

এ জন্য মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ের আবর্ত থেকে উদ্ধার করে তার মন মানসিকতাকে স্থির করার জন্যই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দেয়া হলো, তুমি একমাত্র আল্লাহর গোলাম এবং সেই মহান স্রষ্টার গোলামী করাই তোমার সমগ্র জীবনের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য–যে স্রষ্টার প্রশংসা তুমি করলে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অসীম দাতা ও দয়ালু এবং বিচার দিবসের অধিপতি–যাঁর কাছে তোমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে তোমরা বাধ্য।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই–সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথা মানুষকে শিখিয়ে দেয়ার অর্থই হলো, মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হলো যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্কটা কি। মানুষকে জানিয়ে দেয়া হলো, তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং আমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে–অর্থাৎ তোমরা কেবলমাত্র আমারই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। আর এ কথাও পরিষ্কার যে, আমার মুখাপেক্ষী না হয়ে থেকেও তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই, বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে অবগত আছো। আমার অনুগ্রহ ব্যতিত ক্ষণকালও তোমরা তোমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারো না, আমার অনুগ্রহের ওপরেই তোমাদের সার্বিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এ জন্য তোমরা একমাত্র আমারই কাছে সাহায্য কামনা করবে এবং আমারই দাসত্ব করবে, এটাই তোমাদের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

বস্তুত মানুষ কোন পশু বা প্রাণীর মতো জীব নয়। যারা পৃথিবীতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে, মানুষের অধঃস্তন পুরুষ হলো পশু। তারা মূলতঃ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কৌশল অবলম্বন করে গোটা পৃথিবীতে ভোগের এক ঘৃণ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানবান মানুষই নিজের এই ঘৃণ্য অবস্থান কল্পনাও করতে পারে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এ কথা আল্লাহর কোরআন মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়ে বলেছে, মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ জন্য তাকে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইতর প্রাণীর যেমন কোন ভবিষ্যৎ নেই, মানুষ তেমনি ভবিষ্যৎহীন সৃষ্টি নয়। মানুষকে বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। পূর্বেই এ কথা আমরা পবিত্র কোরআন থেকে উল্লেখ করেছি যে, এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে তা খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। একটি বিশেষ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা গোপন রাখা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ–

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, শুধুমাত্র এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই দাসত্ব করবে। (সূরা আয-যারিয়াত-৫৬)

বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই হচ্ছে মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। আর মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর মালিকানাধীন সত্তা স্বীকার করে নিবে এবং নিজেকে তাঁরই গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করবে।

কারণ মানুষ স্বয়ং নিজে উপাস্য, দাসত্ব লাভের অধিকারী, মনস্কামনা পূরণকারী, আইনদাতা ও বিধানদাতা তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনক্রমেই হতে পারে না। এই অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। মানুষ যদি আল্লাহর দাসত্ব করা ত্যাগ করে অন্য কোন সত্তার পূজা-উপাসনা করে, মূল সৃষ্টি কাজে অথবা বিশ্ব পরিচালনায়, রিযিকদানে, সৃষ্টি রক্ষায় ও সামঞ্জস্য বিধানে, প্রার্থনা মঞ্জুর করার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন শক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে, তাহলে তা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে শির্ক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

পক্ষান্তরে মৌখিকভাবে এসব দিক দিয়ে আল্লাহকে স্বীকার করেও মানুষের ব্যবহারিক জীবন তথা বাস্তব জীবনের প্রতিটি বিভাগে, আইন-বিধান দান এবং সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তিকে–যেমন রাজনৈতিক নেতা, পীর-আলেম, বিচারক, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানকে মেনে নেয়া হয় বা তাদের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও তা মারাত্মক শির্ক হবে। মৌখিকভাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে, নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করে সেই সাথে মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিলে আল্লাহর ইবাদাত করা হয় না।

কারণ মানুষকে যে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হৃদয়গত বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মাধ্যমে অর্জন হতে পারে না এবং শুধুমাত্র এর নামই ইবাদাত নয়। ইবাদাতের কাজে হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে বাস্তবে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের দু'চারটি দিক পালন করা হলো আর গোটা জীবন বিধানই মসজিদ মাদ্রাসায়

বন্দী করে রেখে আল্লাহর ইবাদাত যেমন করা হলো না, তেমনি নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে প্রস্তুত করাও হলো না। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহর গোলামী করবে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করবে এবং সে বিধান গোটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করবে। এ লক্ষ্যেই সূরা ফাতিহায় আল্লাহর শিখানো ভাষায় বান্দাহ্ নিজের পরিচয় পেশ করছে–হে আল্লাহ! আমরা কেবল মাত্র তোমারই গোলাম, আমরা তোমারই দাসত্ব করি।

মহান আল্লাহও তাঁর বান্দাহ্কে জানিয়ে দিলেন, আমি মানুষকে সৃষ্টিই করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে, মানুষ অন্য কারো দাসত্ব করবে, এ জন্য তাদেরকে আমি সৃষ্টি করিনি। মানুষ আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। অন্য কোন শক্তি যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেনি, তখন অন্য কোন শক্তির কি অধিকার থাকতে পারে যে, তারা আমার সৃষ্টি করা মানুষের দাসত্ব লাভ করবে? মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমি–আমিই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আর সেই মানুষ অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করবে, এটা কি করে যুক্তি সংগত ও বৈধ হতে পারে? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমার অন্যান্য সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছি, আর মানুষকে কেবলই আমার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিজগতের দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, সমস্ত সৃষ্টিই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا–

প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই এই মানুষের সহযোগিতায় নিয়োজিত। মানুষ যাবতীয় বস্তু নিচয়কে যেভাবে খুশী ব্যবহার করছে। কোন বস্তুই মানুষের সাথে বিদ্রোহ পোষণ করছে না। এমনটি কখনো হয়নি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে অথচ ধাতব পদার্থ গলছে না। কোন বৃক্ষ কর্তন করা হচ্ছে, অথচ তা পূর্বের মতোই তার নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে থাকলো। আহারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে জবেহ দেয়া হচ্ছে, অথচ উদ্দেশ্যে অর্জন করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষ যে বস্তুকে যেভাবেই ব্যবহার করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাবতীয় বস্তু সেভাবেই সাড়া দিচ্ছে।

কেননা এসব মানুষের খেদমতের লক্ষ্যে সৃষ্টি করে তা মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মানুষের প্রতি এই আদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, সে অনুসারে মানুষ পৃথিবীর জীবন অতিবাহিত করবে, যাবতীয় বস্তু নিচয় আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এভাবে মানুষ যদি নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন করে তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহলে মানুষের জীবন সার্থক হবে, আর যদি সে দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দেয় বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে–এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি–এই কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা নামাজ আদায় করি, তোমাকে সেজ্‌দা করি, রমজান মাসে রোজা পালন করি, পশু কোরবানী দিয়ে থাকি, সামর্থ হলে হজ্জও আদায় করি, তোমার নামের যিকির করে থাকি অর্থাৎ এভাবেই আমরা ইবাদাত সম্পাদন করে থাকি। আসলে ইসলামে ইবাদাত বলতে যা বোঝানো হয়েছে, সেই ইবাদাত কি–তা না বুঝার কারণেই মাত্র গুটি কয়েক আনুষ্ঠানিক কাজকেই মানুষ ইবাদাত হিসাবে গণ্য করেছে। ইবাদাত শব্দটি 'আব্‌দ' শব্দ থেকে নির্গত। আব্‌দ বলে দাস ও বান্দাহ্‌কে। যেমন কোরআন যে আল্লাহর বাণী এ বিষয়ে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِه-

আমি আমার বান্দাহর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না, সেই বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। (সূরা বাকারা-২৩)

উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহৃত আব্‌দ শব্দ দিয়ে 'বান্দাহ্‌কে' অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি শুধু রাসূল ও নবীই নন–তিনি আল্লাহর একজন বান্দাও বটে। আরবী আব্‌দ ধাতুর মৌলিক অর্থ হলো, কোন শক্তির প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার মোকাবিলায় নিজের স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করা, নিজের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য নিঃশেষ করে দেয়া, সেই

শক্তির ইচ্ছার কাছে অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা। মূলতঃ দাসত্ব-গোলামী বা বন্দেগী করার মূল বিষয়ই এটি। একজন আরব বা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই আব্দ শব্দ শোনার সাথে সাথে প্রাথমিক যে ধারণা লাভ করে তাহলো, দাসত্ব বা বন্দেগীর ধারণা। দাসের প্রকৃত কাজই হলো নিঃশর্তভাবে স্বীয় মুনিবের আনুগত্য আদেশানুবর্তিতা।

এভাবেই বিষয়টি থেকে আনুগত্যের ধারণা জন্ম নেয়। একজন দাস শুধু নিজের মুনিবের দাসত্ব, আনুগত্য এবং বন্দেগীর ভেতরে নিজেকে সমর্পিতই করে না, তার নিজের সমগ্র সত্তার সবটুকুই সমর্পণ করে দেয়। প্রতি মুহূর্তে সে মুনিবের প্রশংসা করতে থাকে, মুনিবের প্রতি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে থাকে। মুনিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সে সন্তুষ্ট চিত্তে দেহ-মন-মানসিকতা অবনত করে দেয়। মুনিবের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, মুনিবের ইচ্ছার বিপরীত পথে চলে, মুনিবের বিরোধিতা করে, সে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

ইবাদাত বলতে আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং বান্দাহ্ হয়ে থাকা বুঝায়। আর যিনি আনুগত্য, পূজা-উপাসনা ও দাসত্বের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তিনিই হলেন আব্দ বা বান্দাহ্। আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইবাদাত' শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দাসত্ব ও গোলামী, আনুগত্য ও আদেশানুবর্তিতা এবং পূজা-উপাসনা। সূরা ফাতিহার উল্লেখিত আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটি একই সময়ে ঐ তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা কেবল তোমরাই ইবাদাত করি-এই বাক্যটি উচ্চারণ করে বান্দাহ্ মহান আল্লাহকে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই পূজা করি। আমরা একমাত্র তোমারই অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু তোমারই আদেশ অনুসরণ করে চলি। আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি-তোমরাই গোলামী করি। আমাদের সাথে তোমার পূজা, দাসত্ব-গোলামী, বন্দেগী, আনুগত্যের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে শুধু তাই নয়-এই সম্পর্ক অন্য কারো সাথে নেই এমনকি এই সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য কারো সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই-একমাত্র তোমারই সাথে আমাদের ঐ সম্পর্ক বিদ্যমান।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ-রোজা-হজ্জ আদায় করা, তসবীহ্ ও যিকির করার নামই ইবাদাত নয়-সমগ্র জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর

দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করার নামই হলো ইবাদাত। মহান আল্লাহ বলেন–

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ–

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষেই একমাত্র আল্লাহরই বান্দাহ্ হয়ে থাকো, তাহলে যে সব পবিত্র দ্রব্য আমি তোমাদের দান করেছি, তা অসংকোচে খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো। (সূরা বাকারা-১৭২)

আরবের ইতিহাসেই শুধু নয়, গোটা পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, মানুষ নানা ধরনের প্রথার অনুসরণ করে আসছে। পূর্বপুরুষগণ যেসব প্রথা অনুসরণ করেছে, সেসব প্রথাসমূহ কোন ধরনের বিচার বিবেচনা ব্যতিতই অন্ধভক্তির সাথে পালন করা হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানুষ কোন কোন দ্রব্য আহার করে জীবন ধারণ করবে, সে ব্যাপারেও মানুষ নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। কোন কোন জনগোষ্ঠী নির্বিচারে যে কোন পশু-প্রাণী আহার করছে, আবার কোন জনগোষ্ঠী কিছু সংখ্যক পশু-প্রাণীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তা আহার করা থেকে বিরত থাকছে। এ ধরনের প্রথা সে যুগে আরবেও বিদ্যমান ছিল। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হিসাবে নিজেদেরকে দাবী করার পরে কোন ধরনের আইন-বিধান বা প্রথার অনুসরণ করার কোন অবকাশ আর থাকে না।

এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ঈমান এনে মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে মুখে মুখে সে দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসা অবাঞ্ছিত প্রথা, আইন-বিধানের যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা বৈধ করেছেন, তা অসংকোচে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে অবশ্যই দূরে অবস্থান করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের হক আদায় হবে এবং মুসলমান হওয়া যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা জন্তু আহার করে সে মুসলমান।' অর্থাৎ নামাজ আদায় করা ও কিবলার দিকে মুখ করার পরও একজন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে

জাহিলী যুগের সমস্ত বাধা-নিষেধ, পুর্বপুরষদের অবাঞ্ছিত প্রথাসমূহ, মানুষের বানানো আইন-বিধানের প্রাচীর চূর্ণ না করবে এবং মানব সৃষ্ট অমূলক ধারণা বিশ্বাস ও কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ইসলামের অমীয় সুধায় সঞ্জীবিত হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বলে দাবী করার পরও মানুষের বানানো বাধা-বন্ধনের প্রভাব যার ভেতরে বর্তমান থাকবে, তাহলে বুঝতে হবে–সে ব্যক্তির শিরা-উপশিরায় মানব সৃষ্ট বিধানের বিষাক্ত ঘৃণিত ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, তা উল্লেখিত আয়াত স্পষ্ট করে দিল যে, তোমরা যদি সত্যই আমার গোলাম হয়ে থাকো, প্রকৃতপক্ষেই যদি তোমরা নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য, আদেশানুবর্তিতা পরিত্যাগ করে আমার আনুগত্য গ্রহণ করে থাকো, তাহলে যে কোন ব্যাপারে নেতা-নেত্রীদের মনগড়া বিধানের পরিবর্তে আমার দেয়া বিধান অনুসরণ করতে হবে।

ইবাদাত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। ইবাদাত বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনে যদি আমরা ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখি, তাহলে আমাদের মানব জন্ম বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে চিরতরে হারিয়ে যাবে। পরিণামে আদালতে আখিরাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। মানুষের জীবনে সফলতা আর ব্যর্থতা নির্ভর করে এই ইবাদাত করার ওপর। ইবাদাত হলো, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাধার সৃষ্টি করে, সে শক্তিকে কোরআনের ভাষায় তাগুত বলা হয়।

তাগুত হলো সেই শক্তি, যে শক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর আইন অমান্য করে না–অন্যদেরকেও অমান্য করতে বাধ্য করে। এই তাগুতকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে ইবাতাদের পরিপূর্ণ হক যেমন আদায় করা যাবে না, তেমনি ইবাদাতও হবে শির্ক মিশ্রিত। আর শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তা ধূলার মতোই উড়িয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহর নাজিল করা বিধান পালনের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাকেই তাগুত বলা হয়। আল্লাহর আইন অনুসারে এক ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত করতে চায়, এ ক্ষেত্রে যদি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তারা হবে তাগুত। সামাজিক জীবনে সে

আল্লাহর বিধান পালন করতে চায় অথচ সমাজপতি এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করছে; রাষ্ট্রীয়ভাবে সে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পালন করতে চায়, রাষ্ট্র তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। দলীয়ভাবে সে কোরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে চায়, অথচ সে দল আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে তাকে অগ্রসর করাতে চায়।

এভাবে যে শক্তি আল্লাহর বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারাই আল কোরআনের ভাষায় তাগুত হিসাবে চিহ্নিত হবে। এখন আল্লাহর আদেশ অনুসরণ না করে যারা তাগুতের আদেশ অনুসরণ করেছে, তাগুতের ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছে, তারা আল্লাহর গোলাম না হয়ে তাগুতের গোলাম হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তারা তাগুতের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম বানানোর লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّه لاَاِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

তোমার পূর্বে আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করেছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে। (সূরায়ে আম্বিয়া,আয়াত নং-২৫)

যত সংখ্যক নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা সবাই মানুষের প্রতি ঐ একই আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন এক আল্লাহর ইবাদাত করে। একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর অনুসরণ করে। সমস্ত নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ জাতির প্রতি এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন–

يقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلهٍ غَيْرُه-

হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতিত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। (সূরা আল আরাফ-৮৫)

ইলাহ যেমন দু'জন হতে পারে না–তেমনি ইবাদাতও দু'জনের করা যেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُوْا اِلهَيْنِ اثْنَيْنِ-اِنَّمَا هُوَاِلهٌ

وَّاحِدٌ-فَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ-وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا-اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ-

আল্লাহর আদেশ হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। সমস্ত কিছু তাঁরই, যা আকাশে রয়েছে এবং যা রয়েছে এই পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই নিয়ম-পদ্ধতি সমগ্র বিশ্ব জাহানে চলছে। এরপরও কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে? (সূরা আন্ নাহ্ল-৫১-৫২)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবাদাতের অর্থ হলো—মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা। কেউ যদি রাজনীতি করতে চায় বা রাজনৈতিক দলের একজন হয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কোরআনের বিধান অনুসারে তা করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে, তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর দাস হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে তাগুতের গোলাম হিসাবে চিহ্নিত হবে। জীবনের একটি বিভাগে আল্লাহর ইবাদাত করা হবে, আর অন্যান্য বিভাগে তাগুতের ইবাদাত করা হবে, এ ধরনের শির্কপূর্ণ ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে। সূরা কাহ্ফ-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا-

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের রব্ব-এর দীদার প্রত্যাশা করে, তার উচিত সৎকর্ম করা এবং নিজের রব-এর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতকে শরীক না করা।

নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষ বারবার এই স্বীকৃতিই দিচ্ছে যে, আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর নামাজ শেষেই সেই ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত করছে আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন দিয়ে, বিচারকের আসনে আসীন হয়ে বিচার কার্য পরিচালিত করছে মানুষের বানানো আইন দিয়ে, রাজনৈতিক অঙ্গনে রাজনীতি করছে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি

করছে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে, দেশের জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস–আল্লাহর মোকাবিলায় এ ধরনের শির্কমূলক কথা বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে, এভাবে আল্লাহর সাথে যারা মোনাফেকী করছে, তারা অবশ্যই তাগুতের গোলামী করছে।

ইবাদাতকে সীমিত কোনও একটি অর্থে সীমিত করা মূলতঃ ইসলামকেই সীমিত করার নামান্তর। যারা এই সীমিত ধারণা নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাদের ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ–অসমাপ্ত। মনে রাখতে হবে, এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সাহাবাগণ রক্ত দিয়েছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্ত দিয়েছেন পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার জন্যেই। শির্কপূর্ণ ইবাদাত উৎখাত করে পরিপূর্ণ ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

ইবাদাতের ব্যাপক অর্থ ও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি

মিরাজ উপলক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের যে চৌদ্দটি মূলনীতি দান করেছিলেন, তা সূরা বনী ইসরাঈল-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই চৌদ্দটি মূলনীতির প্রথম নীতিই হলো–

وَقَضَى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ–

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা কারো ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

অর্থাৎ তোমার রব-এর পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত রূপে ফায়সালা হয়ে গিয়েছে যে–দাসত্ব, গোলামী ও আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর গোলামী ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করা যাবে না। পূজা-উপাসনা করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন ধরনের গোলামী, দাসত্ব আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করার কোন অবকাশ মানুষের জন্য নেই। এখন আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এই গোলামী, দাসত্ব-আনুগত্য ও পূজা উপাসনা কি জিনিস এবং মানুষকে কেন এটা করতে হবে।

এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায়। মানুষ যত বড় শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, একটা অবলম্বন সে চায়।

কোন অসহায় দুর্বল মুহূর্তে সে একটা অবলম্বন চায়। মনস্তত্ত্ববিদগণ গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের মনই চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, এমন একটি শক্তিকে অবলম্বন করতে চায়–যে শক্তির কাছে সে নিজেকে নিবেদন করবে। তার মনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলো সে নিবেদন করে নিজেকে ভারমুক্ত করবে। প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, সে যন্ত্রণা মানুষ কারো না কারো কাছে নিভৃতে নির্জনে ব্যক্ত করতে চায়। দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এমন একটি অবলম্বন সে পেতে চায়, যার কাছে সে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে, নিজের মনকে হালকা করতে চায়। তার মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো, অবিকশিত কথাগুলো কারো কাছে ব্যক্ত করে, বিকশিত করে নিজেকে বোঝা মুক্ত করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিগত স্বভাব।

ঠিক তেমনি, মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে স্বাধীন রাখতে পারে না এবং সে ক্ষমতা মানুষের নেই। যেহেতু কোন মানুষই প্রবৃত্তি মুক্ত নয়–প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট করেই মানুষকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। মানুষের এই প্রবৃত্তির মধ্যেই সৃষ্টিগতভাবে নিহিত রয়েছে অন্য কারো আনুগত্য করা। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি হলো, সে কাউকে অসীম শক্তিধর, ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী মনে করবে এবং কারো না কারো আনুগত্য করবে, কাউকে একান্ত আপন ভাববে, কারো কাছে সাহায্য কামনা করবে, কারো আদেশ-নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে, চরম বিপদের মুহূর্তে সে কোন শক্তিকে একমাত্র অবলম্বন মনে করবে। এই স্বভাব মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আনুগত্য করা, কোন প্রয়োজনের সামনে নিজেকে নত করে দেয়া মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়।

খাদ্য গ্রহণ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ক্ষুধা অনুভূত হলে সে অনুভূতি দূরিভূত করার লক্ষ্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করলেই ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে যায়। অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক হলে মানুষ খাদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ঠান্ডা অনুভূত হলে মানুষ শীতবস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। উষ্ণতা অনুভূত হলে মানুষ শীতলতা অনুসন্ধান করে অর্থাৎ শীতল বাতাস বা পরিবেশের আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃষ্টি তাকে সিক্ত করে দিতে পারে, এ জন্য সে মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করে।

নিজের মনের কথা ব্যক্ত করার প্রয়োজনে অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভীতিকর অবস্থা থেকে মানুষ নিরাপত্তার অনুসন্ধান করে। এসব হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাড়িত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষের সমগ্র সত্তার মধ্যে পূজা-উপাসনার প্রেরণা-অনুভূতি প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কারো না কারো সামনে সে মাথানত করে নিজেকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবে, কারো আনুগত্য করবে, এই প্রেরণা মানুষের সমগ্র চেতনার মধ্যে বিরাজ করছে।

বন্দেগী এবং আনুগত্যের মূল বিষয় হচ্ছে, নিজেকে কোন উচ্চতর শক্তি বা সত্তার সামনে মাথানত করে দেয়া। আরবী ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, ইযহারে তাযাল্লুল। অর্থাৎ নিজেকে ছোট করা। এই নিজেকে ছোট করার বিষয়টি কিন্তু মোটেও তুচ্ছ করার বিষয় নয়। মাথানত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন শ্রেষ্ঠ—তার মাথাও নত হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির সামনে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, সুতরাং তাঁর সামনেই কেবল মানুষ মাথানত করতে পারে, অন্য কোন শক্তির সামনে অবশ্যই নয়। পৃথিবীর পশু-প্রাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আহার গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা মাথা নীচু করে খাদ্যের কাছে নিয়ে যায়, তারপর খাদ্য গ্রহণ করে। গরু, ছাগল, উট, ঘোড়া মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পাখী খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সে খাদ্যের সামনে মাথা নীচু করবে না, তাকে হাত দেয়া হয়েছে। হাত দিয়ে খাদ্য উঠিয়ে সে মুখে দিবে। এই বিষয়টি থেকে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হলো, মানুষের এই মাথা কারো কাছে নত হবে না। যিনি খাদ্যদান করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরই কাছে মাথানত হবে।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি। ১৯৯৬ সনে আমাকে যখন আমার নিজের এলাকা ফিরোজপুর সদর এক নম্বর আসন থেকে এলাকার জনগণ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠালো, তখন পার্লামেন্টে একটি বিষয় আমি অবাক-বিস্ময়ে অবলোকন করলাম। কারণ ইতিপূর্বে আমি কখনো পার্লামেন্ট সদস্য হিসাবে সংসদ ভবনে প্রবেশ করিনি। সংসদ সদস্য হিসাবে জীবনের সর্বপ্রথম আমি সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্য সংসদে

প্রবেশ করার সময় মাথা নীচু করে প্রবেশ করছে এবং বের হবার সময়ও ঐ একই ভঙ্গিতে বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা যেন রুকু সেজদা দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। বিষয়টি আমাকে অবাক করলো। বিস্মিত দৃষ্টিতে বিষয়টি আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম। সে মুহূর্তে বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে প্রবীণ একজনকে আমি প্রশ্ন করলাম, লোকজন এভাবে রুকু সেজদা দেয়ার মতো করে আসা-যাওয়া করছে কেন?

তিনি আমাকে জানালেন, পার্লামেন্টের রুল্‌স অব প্রসিডিওর-এ বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে যে, এভাবে মাথা নীচু করে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হবার সময়ও সেই একই ভঙ্গিতে বের হতে হবে। যে বিধি-বিধান দিয়ে সংসদ পরিচালনা করা হয়, আমি সেই রুল্‌স অব প্রসিডিওর গ্রহণ করে তা পাঠ করে দেখলাম তার ভেতরে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৭ (২) বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের সংসদে প্রবেশ ও সংসদ থেকে বের হওয়ার সময় মাথা ঝুঁকানোর নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি আমাকে চরমভাবে ব্যথিত করলো। কারণ এই রীতি বা নির্দেশ ইসলামের বিধানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো কাছে মাথানত করতে পারে না। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ শির্‌ক। এই বিধি কোন মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না।

সংসদে কেউ ইচ্ছে করলেই কথা বলতে পারে না। কথা বলতে হলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে কথা বলতে হয়। আমি কার্যপ্রণালী বিধি পড়লাম। বাংলাদেশের সংবিধান পড়লাম। এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে কয়েক দিন পর কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করলাম। আমি স্পীকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললাম, এই সংসদের একটি বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে–যা সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে কার্যপ্রণালী বিধিতে যা উল্লেখ রয়েছে, সেটা আবার দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম ধারায় উল্লেখ রয়েছে–সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। সংবিধানে যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি–বলা হয়েছে, সেখানে এই সংসদে তার বিপরীত প্রথা চালু করা হয়েছে। মাথানত করে আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের যে রীতি এই সংসদে

প্রচলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এবং শির্ক। কারণ মানুষ সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথানত করতে পারে না। মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করার এই প্রথা সম্পূর্ণ শির্ক–আর শির্ক সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ। নিঃসন্দেহে শির্ক হলো বড় ধরনের জুলুম। (সূরা লুক্মান-১৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমার দেহকে যদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়, তোমাকে যদি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হয়, তবুও তুমি শির্কের প্রতি স্বীকৃতি দিবে না।'

সুতরাং এই সংসদে স্পীকারকে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শনের যে প্রথা চালু রয়েছে, তা সম্পূর্ণ শির্ক, এটা কবীরা গোনাহ্–এই প্রথা হারাম। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি থেকে এই প্রথা বিলুপ্ত করার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার প্রতি এটা দায়িত্ব ছিল এই শির্কের প্রতিবাদ করা। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। যদি সেই হারাম বিধি বিলুপ্ত করা না হয় তাহলে আপনি এবং এই সংসদে যারা আছেন, যারা এই প্রথা অনুসরণ করবেন-তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আসামী হিসাবে পরিগণিত হবেন।

ইযহারে তাযাল্লুল–মানুষ নিজেকে ছোট করবে একমাত্র আল্লাহর সামনে–অন্য কারো সামনে নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মানুষ মাথানত করতে পারে না। বিভিন্ন দেশের আদালতে উকিল বিচারককে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 'মাই লর্ড–My lord অর্থাৎ আমার প্রভু। মনে রাখতে হবে, মানুষের প্রভু হলেন একমাত্র আল্লাহ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের প্রভু কোনক্রমেই হতে পারে না। এভাবে কাউকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ হারাম। এসব হারাম প্রথা অমুসলিমগণ আবিষ্কার করে তা চালু করেছে। এসব প্রথা কোন মুসলমানের জন্য অনুসরণ করা বৈধ নয়।

প্রাকৃতিক আইন বনাম ইবাদাত

বন্দেগী বা আনুগত্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন চাকর তার মনিবের আনুগত্য করে। মনিব যা আদেশ করে, চাকর তা নিঃশর্তভাবে পালন করে থাকে। আনুগত্যের

বিষয়টিকে আরো বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করতে গেলে বলা যায়, একটি দেশের জনগণ সে দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইনের আনুগত্য জনগণ করে থাকে। মানুষ চেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে, বিচারালয়ে, স্থলপথে যান-বাহনে, আকাশ যানে, শিক্ষাঙ্গনে, রাজপথে তথা সর্বত্র দেশের সরকারের আনুগত্য করে থাকে। আকাশ যান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আইন প্রচলিত রয়েছে, তার বিপরীত কোন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারে না। যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় যাত্রীকে সে আইন অনুসরণ করেই আকাশ যানে পরিভ্রমণ করতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যত সংখ্যক মানুষ যে সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বসবাস করে এবং সরকারী আইনের অনুবর্তন করে, তারা সরকারের আনুগত্য করছে। এ কথাটিকে আরবীতে বলতে গেলে বলতে হবে, জনগণ সরকারের ইবাদাত করছে, আনুগত্য করছে, গোলামী করছে–দাসত্ব করছে।

ইবাদাতের এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত অঙ্গনে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সৃষ্টির সর্বত্রই একটি নিয়ম ক্রিয়াশীল। সমস্ত সৃষ্টিই একটি বিশেষ নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃক্ষ, তরু-লতা, সাগর-মহাসাগর, বিশাল জলধী, মৃদু-মন্দ বেগে বা দ্রুত বেগে প্রবাহিত সমীরণ, জীব-জগতের প্রতিটি স্পন্দন, পাহাড়-পর্বত, অটল-অচল হিমাদ্রী, উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম ও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বর্ধিতকরণ, সবুজ শ্যামল বনানীতে পাখীর কুঞ্জন, জীবের বংশবৃদ্ধিকরণ ও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তার অপসারণ, মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রিত বিচরণ, বায়ুমন্ডলের কার্যকরণ, গ্যাসীয় স্তরসমূহের সতর্ক বিচরণ, তাপের আধার সূর্যতাপের ভূ-পৃষ্ঠে নিয়ন্ত্রিত আগমন–এসবের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, তারা নিঃশর্তভাবে কারো আইন অনুসরণ করছে, আইনের আনুগত্য করছে তথা কোন শক্তির ইবাদাত করছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ–

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্যের পন্থা পরিত্যাগ করে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা কি আমার দেয়া জীবন ব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যের বানানো জীবন ব্যবস্থা অনুসন্ধান করো ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার সব কিছুই আমার সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে।

এই ভূ-পৃষ্ঠের একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ বিশাল বিস্তৃত মহাশূন্যে বিচরণশীল দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান গ্রহ-উপগ্রহ-নিহারিকাপুঞ্জ, নক্ষত্র জগৎ অবধি যা কিছু যেখানে রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর নিয়মের আনুগত্য করছে তথা আল্লাহর ইবাদাত করছে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ছুবহানাহু তা'য়ালা যে আইন জারী করেছেন, তার বিপরীত কিছু করা বা তার ব্যতিক্রম করার কোন অবকাশ নেই। এমনটি নয় যে, সৃষ্টির এসব কিছু মানুষের মতো ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর আইন কিছুটা অনুসরণ করছে আবার অন্যের আইনও কিছুটা অনুসরণ করছে। সৃষ্টির এসব বস্তু শির্ক মিশ্রিত ইবাদাত করছে না, তারা পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত রয়েছে। এভাবে গোটা বিশ্বচরাচর ইবাদাত, দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করছে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি কারো নেই। এটাকেই ইংরেজী ভাষায় বলা হয় Law of nature। আরবী ভাষায় বলা যেতে পারে কানুনে ফিতরাত আর বাংলায় বলা হয় প্রাকৃতিক আইন। এই আইনকে লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যে আইন অনুসরণ করে চলেছে অর্থাৎ সৃষ্টি জগতসমূহ ও তার যাবতীয় বস্তু যে বন্দেগী বা ইবাদাত করছে, পবিত্র কোরআন এই ক্রিয়াশীল পদ্ধতিকে তথা বন্দেগী বা ইবাদাতকে নানা শব্দে উপস্থাপন করেছে। কোরআন কোথাও এটাকে সরাসরি ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছে, আবার কোথাও তাকদীস বলেছে, কোথাও তাস্‌বীহ আবার কোথাও সুজুদ শব্দে প্রকাশ করেছে। কোন কোন স্থানে কুনুত শব্দেও বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুই আল্লাহর এবং যেসব ফেরেশ্‌গণ তাঁর নিকটে রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করছে। বন্দেগী করার ভেতরে কোন ধরনের ত্রুটি করছে না। তারা রাত দিন তাঁর প্রশংসা কীর্তনে মাথানত করে কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই আল্লাহর আনুগত্য করছে।'

ফেরেশ্‌তাদের মানুষের ন্যায় বিশ্রামের প্রয়োজন নেই, তারা বিরামহীনভাবে মহান আল্লাহর প্রশংসা করে যাচ্ছে। কত সংখ্যক ফেরেশ্‌তা আল্লাহ ছুব্‌হানাহু তা'য়ালা

সৃষ্টি করেছেন, তার কোন পরিসংখ্যান জানার কোন উপায় মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই। অসংখ্য ফেরেশ্‌তা সেজদায় নিয়োজিত রয়েছেন, রুকু সেজদায় রয়েছেন, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তারা সে দায়িত্ব কোন ধরনের শৈথিল্য ছাড়াই বিরামহীন গতিতে পালন করে যাচ্ছেন। এভাবে সৃষ্টির সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে সৃষ্টির সমস্ত কিছুর আনুগত্যকে ইবাদাত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই ঐ মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ মহাপবিত্র শাসকের গুণ-কীর্তন করছে।'

সৃষ্টিসমূহ আল্লাহর ইবাদাত করছে

সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু আল্লাহর আনুগত্য করছে, এ বিষয়টিকে পবিত্র কোরআনে তাস্‌বীহ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউছাব্বিহু লিল্লাহি–আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়ছে, ছাব্বাহা–ইউছাব্বিহু–তাছ্‌বিহান–অর্থাৎ তাস্‌বীহ পড়েছে, তাস্‌বীহ পড়ছে এবং তাস্‌বীহ পড়বে। এই পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আকাশ ও যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই আল্লাহর তাস্‌বীহ পড়তে থাকবে। হযরত ইউনুছ আলাইহিস্‌ সালাম ঘটনাক্রমে মাছের পেটে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জীবিত থাকবেন এমন আশা ছিল না। বিশাল আকৃতির মাছ তাকে পেটে নিয়ে সাগরের অতল তলদেশে অবস্থান করছিল। তিনি মাছের পেটে গভীর অন্ধকারে অবস্থান করে শুনতে পেলেন, সমস্ত দিক থেকে মহান আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠ করা হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র বালুকণা, শৈবালদাম, পাথরের নুড়িসহ সমস্ত কিছু আল্লাহ নামের যিকির করছে। এভাবে গোটা সৃষ্টিজগত থেকেই আল্লাহ নামের আওয়াজ ভেসে আসছে। এই যিকির শোনর মতো কান যাদের আছে, তাঁরা শুনতে পান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ–

সাত আকাশ–যমীন এবং তার মধ্যে যতসব বস্তু আছে–সকলেই আল্লাহর তসবীহ পড়ছে। এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রশংসা-স্তুতির সাথে তাঁর তসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পারো না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৪৪)

এ আয়াতেও তসবীহ শব্দ দিয়ে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু যে ইবাদাতে রত রয়েছে-আনুগত্য করছে, তা বুঝানো হয়েছে। সূর্য-চন্দ্র, বৃক্ষ, তরু-লতা আল্লাহর বন্দেগী, দাসত্ব বা আনুগত্য করে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ-وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ-

চন্দ্র-সূর্য সবাই পরিক্রমণে নিয়োজিত। তারকামালা ও বৃক্ষরাজি আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে আছে। (সূরা রাহ্মান-৫-৬)

এ আয়াতে ইয়াছজুদান শব্দের মাধ্যমে প্রকৃতির সকল বিষয়ের আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। উদ্ভিদরাজি আল্লাহর তসবীহ্ পাঠ করছে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অকারণে বৃক্ষের পত্র-পল্লব ছিন্ন করবে না। কারণ বৃক্ষের পত্র-পল্লব আল্লাহর তসবীহ পাঠে রত রয়েছে।' প্রয়োজনে গাছ কাটা যেতে পারে, কিন্তু অকারণে তার পাতা ছেঁড়া যাবে না। গোটা প্রকৃতি আল্লাহর আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, পূজা-উপাসনা করছে–এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন কুনুত শব্দ দিয়েও উপস্থাপন করেছে। আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালা বলেন–

وَلَه مَنْ فِى السَّموَاتِ وَالاَرْضِ-كُلٌّ لَّه قَانِتُوْنَ-

আকাশ ও পৃথিবীতে যতো কিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর সবকিছুই তাঁর আদেশের অনুগত। (সূরা রূম-২৬)

এই পৃথিবী পৃষ্ঠের সামান্য একটি ধূলিকণা থেকে শুরু করে ঐ তুষার আবৃত অটল-অচল হিমাদ্রী, মহাশূন্যের কোয়াশার, বিশাল আকৃতির অদৃশ্য দানবীয় ব্লাকহোল, ছায়াপথ আল্লাহর গোলামী করছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ঐ আল্লাহর নির্দেশেই নিয়মিত হয়ে চলেছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, জোয়ারের টানে এই লবণাক্ত পানি নদীর মিষ্টি পানির সাথে মিশে যায়। আবার ভাটির টানে নদীর মিষ্টি পানি সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যায়। এর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অথচ লবণাক্ত পানি মিষ্টি পানির ভেতরে মিশ্রিত হয়ে মিষ্টি পানির মৌলিক গুণাগুণ পরিবর্তন করতে পারে না। আবার মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির মধ্যে মিশ্রিত হয়ে লবণাক্ত পানির মৌলিক গুণাগুণ নষ্ট করে দিতে পারে না। রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে আবর্তিত হচ্ছে। সময়ের যে মুহূর্তে পৃথিবীর যে এলাকায় রাত অবস্থান করে, সেই মুহূর্তে সেখানে দিনের আলো প্রকাশিত হয়না। আবার যেখানে যে মুহূর্তে দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেখানে রাতের ঘন

কালো অন্ধকার ছেয়ে যায় না। এসব কিছু আল্লাহর ইবাদাত করছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ-وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

সূর্যের ক্ষমতা নেই চাঁদকে অতিক্রম করে, রাতের ক্ষমতা নেই দিনকে অতিক্রম করে; এসব কিছুই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। (সূরা ইয়াছিন-৪০)

আল্লাহর নিয়ম অপরিবর্তনীয়

আল্লাহ রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তারা কোন ধরনের বিশ্রাম ব্যতীতই পালন করে যাচ্ছে। পবিত্র কোরআন বলছে, ইলা আজালিম্ মুছাম্মা–অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা এভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকবে। তারপর একদিন মহান আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ যে জিনিসকে যেভাবে ইবাদাত করার আদেশ দিয়েছেন, গোটা প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসই সেভাবেই ইবাদাত করে যাচ্ছে। নারকেল গাছ কখনো তাল দেবে না, আম গাছ কখনো লিচু দেবে না। কাঁঠাল গাছ কখনো বেল দেবে না। গোটা প্রকৃতি জুড়ে আল্লাহ তা'য়ালা যে নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার পরিবর্তন কখনো হবে না–হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً-

আল্লাহর নিয়ম–যা পূর্ব থেকেই কার্যকর রয়েছে, আর কখনও আল্লাহর এ নিয়মে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখবে না। (সূরা ফাতাহ্)

অর্থাৎ আমার প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে, আমার Law of nature–এর মধ্যে কখনো কোন পরিবর্তন হবে না। এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে। কিন্তু সেই ব্যক্তি তার মুখের যে জিহ্বা দিয়ে মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, সেই জিহ্বাও আল্লাহর ইবাদাত করছে। কিভাবে করছে–জিহ্বার প্রতি মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, তার কাজ হচ্ছে যে বস্তুর যে স্বাদ তা গ্রহণ করে জিহ্বা ব্যবহারকারী ব্যক্তির অনুভূতির ভেতরে তা সঞ্চারিত করা। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ব্যক্তি যে জিহ্বা ব্যবহার করে উচ্চারিত করলো, 'আল্লাহ নেই' সেই ব্যক্তি যদি তার জিহ্বার ওপরে কোন তিক্ত, কটু বা অম্ল

জাতিয় বস্তু রেখে আদেশ দিল, এই বস্তুগুলোর প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করে তা আমার অনুভূতিতে সঞ্চারিত করতে পারবে না।' অথবা বস্তু তার প্রকৃত স্বাদ সঞ্চারিত না করে ভিন্ন স্বাদ তাকে সঞ্চারিত করবে–এ ধরনের কোন আদেশ কি জিহ্বা পালন করবে?

নাস্তিক ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগের স্থলে অর্থাৎ টয়লেটে প্রবেশ করে তার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় নাসিকার প্রতি লক্ষ্য করে গুরু গম্ভীর স্বরে আদেশ করলো, 'দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি আমার হাত দিয়ে নাক চেপে ধরার মতো কাজটি করতে অস্বস্তি বোধ করছি। সুতরাং তুমি দুর্গন্ধ গ্রহণ করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দিবে না, পারলে তা সুগন্ধিতে পরিণত করে আমার অনুভূতিতে ছড়িয়ে দাও।'

এভাবে দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যত আদেশই দেয়া হোক না কেন, শরীরের কোন একটি অঙ্গই তাতে সাড়া দেবে না। কারণ তারা শরীরের অধিকারী ব্যক্তির ইবাদাত করে না, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছে। যাকে যে ক্রিয়া সম্পাদনের আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাই পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতি যে ইবাদাত করে যাচ্ছে, যে আনুগত্য প্রদর্শন করছে, তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা করার মাধ্যমে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে অঙ্গুলী সংকেত করছে–আল্লাহ্ আছেন এবং আমরা যেভাবে তাঁর গোলামী করছি, তোমরাও সেভাবে আল্লাহর গোলামী করো।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কোন শক্তির আনুগত্য করা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য বা জন্মগত স্বভাব। গোটা সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করে এবং তা একটি নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে, আনুগত্য করছে তা অবলোকন করে মানুষের মনে অবচেতনভাবেই সুপ্ত আনুগত্যের প্রবণতা জাগরিত হয়েছে। যারা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে বা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে, তারা দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান কোন শক্তিকে স্রষ্টা বা স্রষ্টার প্রতিনিধি অনুমান করে তার পূজা-উপাসনায় নিয়োজিত হয়েছে। এভাবে কেউ বিশাল আকৃতির গাছের, অগাধ জলধীর, সূর্য-চন্দ্রের, নিজ হাতে নির্মিত মৃত্তিকা মূর্তির, তারকামালার, পশু-প্রাণীর এবং পৃথিবীর মাটিকে নিজের মা মনে করে পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। পূজা-উপাসনা করতে করতে মানুষ এতটা নীচের স্তরে নেমে গিয়েছে যে, দেহের প্রধান প্রজনন অঙ্গকে শক্তির প্রতীক মনে করে সেটারও পূজা মানুষ করছে। মানুষ

এসবকে নিজের ইলাহ মনে করে তার পূজা-অর্চনা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ–

আমি-ই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং, তুমি কেবল আমারই ইবাদাত করো। (সুরা ত্বা-হা-১৪)

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি আনুগত্য করা। কিন্তু আনুগত্যের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষ নিজের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে এসব প্রাকৃতিক শক্তিকে ইলাহ মনে করে তার আনুগত্য, পূজা-উপাসনা করে থাকে। চিন্তা করে দেখে না, এসবের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। তারা যেমন আল্লাহর সৃষ্টি, যাদেরকে তারা শক্তির উৎস মনে করে পূজা-উপাসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তেমনি ঐ আল্লাহরই সৃষ্টি। এসব কিছুই ঐ মহান আল্লাহর আনুগত্য করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ–

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যার পূজা-উপসনা, আনুগত্য করছে, তারাও তাদেরই অনুরূপ আমার গোলাম। (সূরা আল আরাফ-১৯৪)

অর্থাৎ তোমরা যাকে ইলাহ মনে তার আনুগত্য করছো, বন্দেগী করছো, ইবাদাত করছো, ওটাও আমারই ইবাদাত করছে এবং তুমি যেমন আমার গোলাম, তুমি যার ইবাদাত করছো, সেটাও আমারই গোলাম। সুতরাং আমার সৃষ্টির গোলামী ত্যাগ করে আমার গোলামী করো। তোমরা যাদেরকে ডাকছো, তারা এ সংবাদ পর্যন্ত জানে না যে, তোমরা তাকে ডাকছো এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা তোমাদের ডাকের সাড়া দিতে পারবে না। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّاَيَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে না, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে–এ সংবাদ পর্যন্ত যাদের জানা নেই। (আহ্‌কাফ-৫)

আনুগত্য প্রবণতার কারণে একশ্রেণীর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের আনুগত্য বা ইবাদাত করে থাকে, তারা মানুষের কোন কল্যাণ-অকল্যাণ করতে সমর্থ নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّ هُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ–

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। (সূরা ইউনুস-১৮)

একশ্রেণীর নির্বোধ মানুষ যাদের আনুগত্য, ইবাদাত করে থাকে, তারা কোন ক্ষতিও করতে পারে না, আবার কোন উপকারও করতে পারে না। এদের ওপরে যদি একটি মাছিও বসে, এরা সে মাছিকেও তাড়িয়ে দিতে অক্ষম। আল্লাহ বলেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

বলো! তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত পূজা-উপাসনা করছো? যারা না পারে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে, না পারে কোন উপকার করতে। (সূরা মায়েদাহ্-৭৬)

একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো কোন কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না। যেহেতু তিনিই মানুষের প্রতিপালক। তাঁরই গোলামী করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ–

সে আল্লাহই তোমাদের রব্ব ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি সমুদয় বস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো এবং তিনি সব জিনিস সম্পর্কে যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত আছেন। (সূরা আনআম-১০২)

মানুষ যাদেরকে আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত লাভের যোগ্য মনে করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টি হয়ে আরেক সৃষ্টির দাসত্ব-গোলামী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ আর কিছু নয়। একশ্রেণীর মানুষ আগুনকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা করে থাকে। অথচ সেই আগুনের ভেতরে যখন মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে নিক্ষেপ করা হচ্ছিলো, তখন তিনি নিরুদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিজেকে আগুনে ফেলে দেয়ার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। কারণ তিনি

জানতেন, তিনি যে আল্লাহর গোলামী করেন, এই আগুনও সেই আল্লাহরই গোলাম। আগুনকে যদি আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাহলে আগুন তাকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করতে পারে। আর আল্লাহ যদি আগুনকে আদেশ না করেন, তাহলে আগুনের ক্ষমতা নেই তার দেহের একটি পশমকে পুড়িয়ে দেয়। সেই চরম মুহূর্তে আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণ এসে তাঁকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল, এক আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ফেরেশ্‌তাদের সাহায্য প্রস্তাব বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, আল্লাহ্ আগুনকে আদেশ দিলেন ইবরাহীমের প্রতি আরামদায়ক হয়ে যাওয়ার জন্যে, আগুন আরামদায়ক হয়ে গেল। উত্তপ্ত অগ্নিকুন্ড পরিণত হলো চিত্তাকর্ষক মনোরোম দৃশ্য সম্পন্ন পুষ্প উদ্যানে। বিশ্বকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বিষয়টি এভাবে প্রকাশ করেছেন–

আজ ভি হো যো ইবরাহীম কা ইমাঁ পয়দা
আগ্ কার ছাক্‌তি হ্যায় এক আন্দাজ গুলিস্তা পয়দা।
ইবরাহীমের ঈমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান
গড়তে পারেন অগ্নিকুন্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান।

অর্থাৎ এখনো যদি ইবরাহীমের মতো ঈমান কারো ভেতরে জাগ্রত হয় এবং তাকে যদি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অগ্নিকুন্ড পুষ্প কাননে পরিণত হতে পারে। সুতরাং গোলামী করতে হবে মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা'য়ালার। একজন গোলাম হয়ে আরেকজন গোলামের কাছে হাত বাড়ালে সে হাত অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে। একজন দাস আরেকজন দাসকে কিছুই দিতে পারে না। একজন পথের ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে কিভাবে ভিক্ষা দিতে পারে? সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, একটি পশু আরেকটি পশুর আইন মানে না, আনুগত্য করে না, দাসত্ব করে না, ইবাদাত করে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হয়ে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সামনে কিভাবে মাথানত করতে পারে? কিভাবে মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষের বানানো আইনের গোলামী করতে পারে? সুতরাং, বিশ্বপ্রকৃতি–প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ, প্রাকৃতিক আইন মানুষকে যেদিকে–যে শক্তির ইবাদাত করার জন্য নীরব নির্দেশ করছে, মানুষের স্বভাবজাত সেই আনুগত্যকে সেদিকেই প্রদর্শন করতে হবে।

আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত

এই পৃথিবী বা সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল যে নিয়ম রয়েছে, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এসব কিছু অনুভব করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের শ্রবণ শক্তি-দর্শন শক্তি দান করেছেন। চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোন চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিষ দান করেছি। তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছি। দৃষ্টি শক্তিদান করেছি এবং চিন্তা করার মত মগজ দিয়েছি।

জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, চোখ, কান খেল-তামাশার জন্য দেয়া হয়নি। প্রকৃতিকে অনুভব করার জন্য দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি কোন দিকে, কোন মহাশক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, তা অনুধাবন করে তাঁর গোলামী-দাসত্ব করার জন্যই দেয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়লো, কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টার প্রতি তার দাসত্বের অঙ্গুলি সংকেত ধরা পড়লো না। এই কান দিয়ে মানুষ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু শুনলো, কিন্তু মহান আল্লাহর আহ্বান সে শুনলো না, তার কানে মহাসত্যের ডাক প্রবেশ করলো না।

যে জ্ঞান মানুষকে দেয়া হলো, সে জ্ঞান প্রয়োগ করে সে দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলো, মানুষ যেন শকুনের থেকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দূর-বহু দূরের বস্তু দর্শন করতে সক্ষম হয়। সে আকাশ যান আবিষ্কার করলো যেন পাখির চেয়ে দ্রুত গতিতে মহাশূন্যে উড়তে পারে। স্থলপথে দ্রুত যান আবিষ্কার করলো যেন সে চিতা বাঘের চেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে পারে। সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যেন মহাসাগরের অতল তলদেশে মাছের থেকেও দ্রুত গতিতে চলতে পারে।

মৃত্তিকা গভীরে কোথায় কি অবস্থান করছে, শতকোটি দূরে মহাশূন্যে কোন গ্রহের কি অবস্থা, তা পর্যবেক্ষণ করছে, মহাশূন্যে উড়ন্ত পাখী যেখানে পৌঁছতে সক্ষম

নয়, মানুষ সেখানে তার গর্বিত পদচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে–অথচ তার আত্মার বিকাশ সাধনে সে চরম ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছে। এক আল্লাহর আনুগত্যের, দাসত্বের, গোলামীর মাধ্যমে মানুষের আত্মার বিকাশ সাধিত হয়, মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় এবং এটাই মানব জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্খিত সাফল্য–এই ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যর্থতার গ্লানী বহন করছে। আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে মানুষের মনুষত্ব বিকশিত হতে না দেখে কবি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

মুঝে এ ডর হ্যায় কে দিলে জিন্দা তু না মর যা–য়ে

কি জিন্দেগানী ইবারাত হ্যায় তেরে জিনেছে।

হে আমার জাগরিত আত্মা, আমি তোমার অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করছি। সত্যই যদি তোমার অপমৃত্যু ঘটে, তাহলে আমার জীবিত থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

বর্তমানে আমরা আমাদের আত্মার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কোন ভূমিকা পালন করছি না। আমাদের অসাবধানতার কারণে, আমাদের অসচেতনতা–অবহেলার কারণে জীবন্ত আত্মার অপমৃত্যু ঘটছে। মানুষ তার দেহের সৌন্দর্য বর্ধিত করার লক্ষ্যে অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করেছে। পোষাক-পরিচ্ছদের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিদিন নিত্য-নতুন ফ্যাশন বের করছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত করার লক্ষ্যে আত্মার উন্নতি সাধন করার জন্য কোন ধরনের প্রচেষ্টা নেই। মানুষকে হৃদয় দেয়া হলো, চোখ-কান দেয়া হলো, চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মগজ দেয়া হলো, এসব প্রয়োগ করে তারা বস্তুগত উন্নতি সাধন করলো। অথচ প্রধান যে দিকটির উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এসব দান করা হয়েছিল, সেদিকে তারা দৃষ্টিপাত করলো না। যারা এ ধরনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–أُ لَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ এরা সব চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (সূরা আরাফ)

কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তথা আত্মার বিকাশ সাধিত হলে মানুষ তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজের আত্মার পরিচিতি যখন লাভ করে, তখন সে তার প্রতিপালকের পরিচয়ও অবগত হতে পারে। কিন্তু আত্মাকে চেনা বা মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মানুষের কোন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্যই পবিত্র কোরআন এই শ্রেণীর মানুষকে পশুর সাথে তুলনাই শুধু করেনি, পশুর থেকেও

অধম হিসাবে উপস্থাপন করেছে। কারণ এক শ্রেণীর মানুষ তার মনিবের পরিচয় না জানলেও পশু তার মনিবের পরিচয় জানে। কুকুর তার মনিবকে চিনে এবং মনিবের আদেশ পালনে তৎপর থাকে। অথচ একশ্রেণীর মানুষ আল্লাহকে চিনে না, তাঁকে অস্বীকার করে। সুতরাং ঐ অস্বীকারকারী মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণীর সম্মান ও মর্যাদা মনিবের কাছে অনেক বেশী।

মানবাত্মার খাদ্য

মানুষের আত্মা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে বিকশিত হবে, তা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ এই আত্মার অবস্থান, তার আকার-আকৃতি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয় এবং সে জ্ঞানও মানুষের নেই। সুতরাং যে জিনিস সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক কোন জ্ঞান নেই, সেই জিনিসের উন্নতি ও বিকাশ সাধন মানুষ করবে কিভাবে ?

এ জন্য আত্মার বিকাশ ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আত্মার যিনি স্রষ্টা–যিনি আত্মার আকার-আকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন, তিনিই পদ্ধতি দান করেছেন। একটি বিষয়ের প্রতি মানুষকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষসহ জীবকুলের জীবিত থাকার প্রয়োজনে, জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অসংখ্য খাদ্য উপকরণের একটিও মহাশূন্যে পাওয়া যাবে না। সমস্ত খাদ্য পাওয়া যায় জল-স্থলে। খাদ্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রই হলো পানি আর মাটি। কারণ মানুষের দেহ নির্মিত হয়েছে মাটির সার-নির্যাস থেকে। যা দিয়ে দেহ নির্মিত হয়েছে, দেহের প্রয়োজনে তা থেকেই উৎপাদিত খাদ্য দেহ গ্রহণ করে দেহের উন্নতি সাধিত হয়।

কিন্তু দেহের চালিকা শক্তি হলো আত্মা বা রুহ্। এই রুহ্ মাটির সার-নির্যাস দিয়ে প্রস্তুত হয়নি। এ কারণে মাটি থেকে উৎপাদিত কোন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রুহের নেই। মৃত্তিকা থেকে রুহ্ আহরোণ করে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়নি, এ জন্য মাটিতে উৎপাদিত কোন খাদ্য দ্বারা রুহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেখান থেকে রুহ্ মানব দেহে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই স্থান থেকেই রুহের খাদ্যও প্রেরণ করা হয়েছে। রুহ্কে এই খাদ্যদান করলেই কেবল রুহ্ বিকশিত হয় তথা মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধন হয়। এই রুহ্ সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার কোন শেষ নেই। আল্লাহর রাসূলকেও রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বনী ইসরাঈল-এর আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ-قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

এরা আপনাকে রুহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দিন, এই রুহ্ আমার রব-এর আদেশে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।

এই রুহ্কে বিকশিত করার জন্য এর খাদ্য প্রয়োজন। রুহ্ আল্লাহর আদেশে আগমন করেছে আলমে আরওয়াহ্ থেকে আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার খাদ্যও প্রেরণ করেছেন লৌহ মাহ্ফুজ থেকে। লৌহ মাহ্ফুজ থেকে প্রেরিত রুহের সেই খাদ্যের নাম হলো কোরআন। এই কোরআন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাভরে তেলাওয়াত করতে হবে, এর আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করতে হবে। রুহের খাদ্যই হলো আল্লাহর কোরআন। দেহকে খাদ্যদান না করলে দেহ যেমন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে, কর্মের উপযোগী আর থাকে না, তেমনি আত্মাকেও খাদ্যদান না করলে আত্মা দুর্বল-নির্জীব হয়ে পড়ে। বাহন হিসাবে বা কৃষি কাজের জন্য যারা চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহার করে, এসব জন্তুকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদান করতে হয়। নতুবা জন্তু কর্ম উপযোগী থাকে না। খাদ্যদান না করে জন্তুকে কর্মে নিয়োগ করলে জন্তু অক্ষমতার পরিচয়ই দিবে।

তেমনিভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ ও আত্মার উন্নতিকল্পে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য না দিলে সে নিজেকে এবং তার বাহন দেহকে কিভাবে আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত করবে ? আত্মাকে তার প্রকৃত খাদ্য না দিলে আত্মা কি নিজেকে বিকশিত করতে পারে না ? অবশ্যই পারে। মানুষ যেমন তার প্রকৃত খাদ্য না পেলে বা দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার লোকজন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করে নিজেদেরকে দুর্বল করে, তেমনি আত্মা তার প্রকৃত খাদ্য লাভ না করলে অখাদ্য-কুখাদ্য আহার করবে অর্থাৎ আত্মা কদর্য রূপে গর্হিত পথে ধাবিত হবে। আত্মার প্রকৃত খাদ্য কোরআন যদি সে লাভ করতো, তাহলে সে নিজেকে বিকশিত করতো সুন্দর ও কল্যাণের পথে। সে আত্মার দ্বারায় পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণ সাধিত হতো। গোটা পৃথিবী জান্নাতের এক উদ্যানে পরিণত হতো।

কোরআন নামক খাদ্য লাভকারী আত্মা সুন্দর আর কল্যাণের সুষমায় বিকশিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতন মুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ, ভীতিহীন সুখী সমৃদ্ধশালী এক পৃথিবী মানবতাকে উপহার দিতে সক্ষম হতো। ইসলামের সোনালী যুগের দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, সে সময়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শাসকগোষ্ঠী পর্যন্ত সবাই দেহকে অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে স্ফিত না করে আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতেন। ফলে তারা পৃথিবীতে সত্য আর কল্যাণের পতাকা উড্ডিন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুদূর অতীতে এবং বর্তমানেও যারা আত্মাতে তার প্রকৃত খাদ্য না দিয়ে দেহকে বৈধ-অবৈধ খাদ্য দিয়ে স্ফিত করেছে বা করছে, তারা সত্য, সুন্দর আর কল্যাণের হন্তারক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী শোষণ, নির্যাতন আর অশান্তির দাবানল বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এসব আত্মা প্রকৃত খাদ্য যখন লাভ করছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই আত্মা অখাদ্য আর কুখাদ্য লাভ করে অন্যায় অসুন্দরের পথেই ধাবিত হচ্ছে।

এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাবে আশে-পাশে বিচরণশীল মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে–অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের বিধান অনুসারে চলে, তারা সত্য সুন্দর আর কল্যাণ পিয়াসী। আর যারা আত্মাকে কোরআন নামক খাদ্যদান করে না–অর্থাৎ কোরআনের বিপরীত পথে চলে, তারা সত্য সুন্দর কল্যাণের হন্তারক, অশান্তি সৃষ্টিকারী, অরাজকতা সৃষ্টিকারী ও মানবতার ধ্বংস সাধনকারী। এই কোরআনই আত্মার একমাত্র উৎকৃষ্ট খাদ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ–

আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব এনে দিয়েছি যাকে আমি জ্ঞান-তথ্যে সুবিস্তৃত বানিয়েছি এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (সূরা আল আ'রাফ-৫২)

এই কোরআন মানুষকে নিরাময়তা দান করে। কলুষিত আত্মাকে সুন্দর শুভ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আত্মার কলুষ-কালিমা দূর করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

আমি এই কোরআন নাজিল প্রসঙ্গে এমন কিছু নাজিল করি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮২)

এই কোরআন মানুষকে সত্য সহজ সরল পথপ্রদর্শন করে। মানুষকে নিরাময়তা

দান করে প্রকৃত সত্যে উপনীত করে। সূরা হামীম সিজদায় মহান আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ–

এদের বলো, এই কোরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়াত ও নিরাময়তা।

এই কোরআন মানুষের আত্মাকে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যবোধ শিক্ষা দেয়। কোরআন প্রদর্শিত পথে যে আত্মা ধাবিত হয়, সে আত্মার দ্বারাই পৃথিবীতে মানবতা বিকশিত হয়। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াত করে এবং এর বিধান নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে আত্মাকে বিকশিত করতে হবে, তাহলেই কেবল ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা সম্ভব হবে।

ইবাদাতের তাৎপর্য

ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাতের মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ–

(হে রাসূল!) আমি তোমার কাছে হকসহ এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো। (সূরা যুমার-২)

এ আয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সে ইবাদাত হতে হবে এমন, যা আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ আয়াতে ইবাদাত শব্দের পরে দীন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্বের সাথে মানুষ যেন আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে, বরং সে যেন একমাত্র আল্লাহরই পূজা-উপাসনা, বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করে। একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসরণ করে। ইবাদাত তো কেবল তারই করা যেতে পারে, যিনি অসীম শক্তিশালী এবং অক্ষয়-চিরঞ্জীব। যা ভঙ্গুর এবং ক্ষণস্থায়ী তার ইবাদাত করা যেতে পারে না। কোরআনে সূরা মু'মিনের ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

هُوَ الْحَيُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
–اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমাদের দীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টিজগতের রব্ব আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহই হলেন বাস্তব ও প্রকৃত সত্য। তিনি অনন্ত এবং অনাদি। একমাত্র তিনিই আপন ক্ষমতায় জীবিত। তাঁর সত্তা ব্যতিত আর কারো সত্তাই অনাদি ও চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই আল্লাহ প্রদত্ত, মরণশীল ও ধ্বংসশীল। সুতরাং ইবাদাত হতে হবে একমাত্র সেই সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ তাঁরই ইবাদাত করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তাঁরই আদেশ অনুসরণ করবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে।

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই বর্তমানে মানুষ ইবাদাত বলতে শুধু কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকেই একমাত্র ইবাদাত বলে মনে করেছে। নামাজ আদায় করা যেমন ইবাদাত তেমনি নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। রোজা পালন করাও ইবাদাত এবং রোজা পালন না করাও ইবাদাত। নামাজ সঠিক ওয়াক্তে আদায় করার নাম ইবাদাত। আবার নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ সূর্য উদয়ের সময়, অস্তের সময় এবং সূর্য ঠিক যখন মাথার ওপরে অবস্থান করে, এ তিন সময়ে নামাজ আদায় না করাও ইবাদাত। এই তিন সময়ে সেজ্দা করা জায়েয নেই–হারাম করা হয়েছে। সক্ষম হলে গোটা বছর রোজা পালন করলে ইবাদাত হবে, কিন্তু বছরে পাঁচ দিন রোজা পালন না করা ইবাদাত। এই পাঁচ দিন রোজা পালন করা হারাম করা হয়েছে।

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত

মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্মকেই ইবাদাত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষের চোখের চাওনি-এটাও ইবাদাতে পরিণত হতে পারে। এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোন সন্তান যদি তাঁর গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার দিকে পরম মমতাভরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আল্লাহর রাসূল বলেন, সে সন্তানের আমলনামায় একটি কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে। উপস্থিত সাহাবাগণ জানতে চেয়েছেন, কোন সন্তান যদি প্রতিদিন একশত বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে কি সে একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লাভ করবে?

আল্লাহর রাসূল জবাব দিলেন, তোমরা জেনে রেখো, মহান আল্লাহর রাহমতের ভান্ডার অফুরন্ত। আল্লাহর কোন বান্দাহ্ যদি প্রতিদিন তার মাতা-পিতার দিকে একশত বার মমতা আর শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহলে সে বান্দার আমলনামায় প্রতিদিন একশত কবুল নফল হজের সওয়াব লেখা হবে।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ইবাদাত। উঠা বসা, হাঁটা-চলা, কথা বলা, কথা শোনা, দাঁড়ানো, ঘুমানো, আহার, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করা, সন্তান প্রতিপালন করা, চাকরী করা, ব্যবসা করা, শিক্ষা দেয়া ও গ্রহণ করা, যুদ্ধ করা, যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা, আন্দোলন-সংগ্রাম করা, নেতৃত্ব দেয়া, কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা, বিচার-মীমাংসা করা, দেশ শাসন করা, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা, জনসেবা করা, কল্যাণকর কোন কিছু আবিষ্কার করা তথা যে কোন ধরনের বৈধ কর্মকান্ড করাই হলো ইবাদাত। শর্ত শুধু একটিই যে, সমস্ত কর্ম হতে হবে মহান আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। এ জন্যই সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছে–আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব বা ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আরবী না'বুদু শব্দের মধ্যে দুটো কাল রয়েছে। একটি বর্তমান কাল এবং অন্যটি ভবিষ্যৎ কাল। নামাজের মধ্যে বান্দাহ্ ইয়্যা কানা'বুদু বলে এ কথারই স্বীকারোক্তি করে যে, আমি তোমার আদেশে এখন নামাজ আদায় করছি। ক্ষণপূর্বে আমার জন্য যেসব কাজ হালাল ছিল, নামাজের মধ্যে আমার জন্য সেসব হালাল কাজগুলো হারাম হয়ে গিয়েছে। তোমার দেয়া বৈধ খাদ্যগুলো আমার জন্য আহার করা বৈধ ছিল, নামাজ আদায়ের সময়ে তোমার আদেশে সে বৈধ খাদ্য গ্রহণ করা আমি আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে বাকশক্তি দান করেছো, আমার জন্য কথা বলা বৈধ ছিল। আমি এইক্ষণে তোমার আদেশ অনুসারে কথা বলা হারাম করে দিয়েছি। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে দৃষ্টিশক্তি দান করেছো। চারদিকের দৃশ্য অবলোকন করা আমার জন্য বৈধ ছিল। নামাজ আদায়ের এই মুহূর্তে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা তোমার আদেশে আমি আমার জন্য হারাম ঘোষণা করে তা থেকে বিরত রয়েছি। আমি আমার জন্য চিরস্থায়ী হালাল বিষয়গুলো নামাজ আদায়ের মুহূর্তে স্বল্প সময়ের জন্য যেমন তোমার আদেশে হারাম করেছি, তেমনি তুমি যে বিষয়গুলো চিরস্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছো, নামাজের বাইরে আমি আমার জীবনে সে বিষয়গুলোও হারাম ঘোষণা করবো।

ইয়্যা কানা'বুদু–বলে বান্দাহ তাঁর আল্লাহর কাছে বর্তমান কালে যা করছে এবং ভবিষ্যতে কি করবে, সে কথারই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। অর্থাৎ যেভাবে তোমার আদেশে নামাজ আদায় করছি, নামাজের বাইরের জীবনও তোমারই আদেশ অনুসারেই পরিচালিত করবো। আল্লাহকে সিজ্‌দা দিলেই সওয়াব লাভ কার যায়।

কিন্তু আল্লাহর দেয়া নিয়ম হলো, নামাজের এক রাকাতের মধ্যে সিজদা দিতে হবে দুটো। কোন ব্যক্তি যদি দুটো সিজদার পরিবর্তে অধিক সওয়াবের আশায় পাঁচ ছয়টি সেজদা দেয়, তাহলে তার নামাজই হবে না। ফজরের ফরজ নামাজ দুই রাকাত আদায় করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দুই রাকাতের স্থলে চার রাকাত আদায় করে তাহলে তা ইবাদাত হবে না।

এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি যদি যোহরের ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত আদায় করে, মাগরিবের ফরজ নামাজ তিন রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে হবে আল্লাহদ্রোহী। যথাযথভাবে আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করাই হলো ইবাদাতের সঠিক তাৎপর্য। এই তাৎপর্য অনুধাবন করেই আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদাত করতে হবে।

মানুষ নামাজ আদায় করে যার আদেশে, সে তার গোটা জীবন পরিচালিত করবে একমাত্র তাঁরই আদেশে। যাঁর আদেশে নামাজ আদায় করা হচ্ছে, তাঁরই আদেশে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালিত হবে। নামাজে সেজ্‌দা দেয়া হচ্ছে যাঁর আদেশে, একমাত্র তাঁরই আদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র নীতি, স্বরাষ্ট্র নীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-বাণিজ্য নীতি পরিচালিত হবে। নামাজ যাঁর আদেশে আদায় করা হচ্ছে, দেশের সরকার ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট একমাত্র তাঁরই আদেশ অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা হবে। এগুলো যদি না হয়, তাহলে এই অসম্পূর্ণ ইবাদাত দিয়ে সফলতা আশা করা বৃথা।

সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিতে হবে ঐ মহান আল্লাহর সামনে–যিনি সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছুর পরিচালক, শাসক ও প্রতিপালক। আল্লাহর ওপরে বান্দার যেমন হক রয়েছে, তেমিন রয়েছে বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আল্লাহর রাসূল বলেন, বান্দার ওপরে আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দাহ্ কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব বা ইবাদাত করবে, এই ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাত মিশ্রিত করবে না, ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোন শির্‌ক করবে না। গোলামী, বন্দেগী, ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর। এটাই হলো বান্দার ওপরে আল্লাহর হক। আর আল্লাহর ওপরে বান্দার হক হচ্ছে, সেই ইবাদাতকারী আবেদ বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন।

বন্দেগী ও ..সত্বের ক্ষেত্রে ইবাদাত

আল্লাহর বিধান এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে কোন দার্শনিক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, আইনবিদের বিধান ও নেতৃত্ব অনুসরণ করা এবং এসব চিন্তাবিদগণকে বা নেতাদেরকে মৌখিকভাবে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাদেরকে শরীক করারই শামিল। বরং এসব ব্যক্তিত্বদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় তাদের বানানো আইন-বিধানের আনুগত্য করা হয়, তাহলেও আনুগত্যকারী শির্কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে–এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহর বিধানের মোকাবিলায় যেসব মানুষ ভিন্ন বিধান অনুসরণ করতে আদেশ দেয়, অনুপ্রাণিত করে, কোরআন এদেরকে শয়তান হিসাবে ঘোষণা করেছে। অথচ মানুষ শয়তানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে থাকে। এভাবে অভিশাপ দেয়ার পরও যারা এসব মানুষরূপী শয়তানদের অনুসরণ করবে, কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছে–তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছো। এই শির্ককে বিশ্বাসগত শির্ক না বলে বলা হয় কর্মগত শির্ক। এই ধরনের কর্মগত শির্ক যারা করছে, কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হবে এবং এদের সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَاءِ ىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا–

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবেন, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে? (আহকাফ্)

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই লক্ষ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণয়ন করে নেতৃবৃন্দ এবং দলের কর্মীরা তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপরতা চালায়। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, কর্মীরা ময়দানে তাই পালন করে। এখন এসব নির্দেশ যদি ইসলামের বিপরীত হয় এবং কর্মীরা যদি তা পালন করে, তাহলে তারা পরোক্ষভাবে ঐ দলের নেতৃবৃন্দকেই নিজেদের প্রভু বলে মেনে নিল এবং তারা নেতৃবৃন্দের ইবাদাত করলো। অথচ এই কর্মীরা মুখে আল্লাহকেই প্রভু বলে স্বীকার করে। এটাই হলো কর্মগত শির্ক। এই শির্ক থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান যারা দিল, তারাই হলো

তাগুত। এদের বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করার জন্যই কোরআন মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন বলছে–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-لاَ انْفِصَامَ لَهَا-

যারা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে যে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয়। (সূরা বাকারা-২৫৬)

মুখে মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করা যাবে না। প্রথমে অন্যের তথা তাগুতের আনুগত্য অস্বীকার করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে। তারপর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই নিরঙ্কুশ আনুগত্য–ইবাদাত করতে হবে। আরবী ভাষায় কারো ফরমানের অনুগত হওয়া এবং তার ইবাদাতকারী হওয়া প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করে সে যেন তারই ইবাদাত করে।

এভাবে ইবাদাত শব্দটির তাৎপর্যের ওপর এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাঁর ছাড়া অন্য সবার ইবাদাত পরিত্যাগ করার যে আদেশ নবী-রাসূলগণ তাঁদের মহান আন্দোলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন, তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ কি ছিল তা অনুধাবন করা যায়। তাঁদের কাছে ইবাদাত নিছক কোন পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান ছিল না। তাঁরা মানুষকে এই আহ্বান জানাননি যে, তোমরা আল্লাহর পূজা-উপাসনা করো এবং দেশ ও জাতির নেতৃবৃন্দের বা অন্য দার্শনিক-চিন্তাবিদ বা ভিন্ন কোন শক্তির বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করতে থাকো। বরং তাঁরা যেমন মানুষকে আল্লাহর পূজারী হিসাবে গড়তে চাইতেন সেই সাথে সাথে আল্লাহর আদেশের অনুগতও করতে চাইতেন।

ইবাদাত শব্দের এই উভয় অর্থের দিক দিয়ে তাঁরা অন্য কারো ইবাদাত করাকে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্টতা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবাদাত শব্দের অর্থ দাসত্ব ও আনুগত্য বুঝায় এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদদের কথায়। হযরত মুছা ও হারুন আলাইহিস্ সালামের আহ্বানের জবাবে তারা বলেছিল–

فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ-

আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন লোকের প্রতি ঈমান আনবো? আর তারা আবার এমন লোক যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস। (সূরা মু'মিনুন-৪৭)

অর্থাৎ যে জাতিকে ফেরাউন ও তার রাজ পরিষদগণ শাসন করতো, সে জাতিকে তারা নিজেদের গোলাম বা দাস মনে করতো। হযরত মুছা ও হারুন আলাহিস্ সালাম ছিলেন ফেরাউনের অধীনস্থ জাতির সন্তান। এ জন্য তারা তাদের কথার মধ্যে উল্লেখ করেছিল, এরা দু'জন নিজেদেরকে নবী হিসাবে দাবী করে নিজেদেরকে আমাদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছে, এরা আমাদের মত মানুষই শুধু নয়–যারা আমাদের আইন-বিধান অনুসরণ করতে বাধ্য, আমাদের আনুগত্য, বন্দেগী, গোলামী ও ইবাদাত করে–অর্থাৎ আমাদের দাস, সেই দাস সম্প্রদায়ের সন্তান এরা। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেল, কোন শাসকের শাসনাধীনে বাস করে শাসকের আনুগত্য করাকেও ইবাদাত বলা হয়। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন–

أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَ اتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ-

তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করে চলো এবং আমার আনুগত্য করে কাজ করো। (সূরা নূহ-৩)

তিনি তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন, সমস্ত কিছুর বন্দেগী, দাসত্ব ও গোলামী সম্পূর্ণ পরিহার করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহকেই নিজের একমাত্র মা'বুদ মেনে শুধু তাঁরই পূজা-উপাসনা-আরাধনা করবে। একমাত্র তাঁরই দেয়া আইন-বিধান, আদেশ-নিষেধের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিবে। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের ওপরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও যেসব জাতির কাছে আল্লাহর বিধান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের প্রতিও একই আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন–

وَمَاأُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَه الدِّيْنَ-

আর তাদেরকে এই আদেশ ব্যতীত অন্য কোন আদেশই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে নিজেদের দীনকে তাঁরই জন্য খালেছ করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। (সূরা বাইয়্যেনা-৫)

ইবাদাতের পূর্ব শর্ত লক্ষ্য স্থির করা

আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি–সূরা ফাতিহায় বান্দাহ এ কথাটি আল্লাহর কাছে নিবেদন করলো। কিন্তু বান্দাহ্ জানে না দাসত্ব করা ও সাহায্য প্রার্থনা করার সঠিক পদ্ধতি কোনটি এবং তার ইবাদাতের লক্ষ্য কি। এ জন্য মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে বান্দাহ্কে অনুগ্রহ করে সঠিক পদ্ধতি অবগত করেছেন বান্দার ইবাদাত কাকে লক্ষ্য করে করা হবে, তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

তোমরা প্রতিটি ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো, নিজের দীনকে শুধুমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। (সূরা আল আ'রাফ-২৯)

এ আয়াতে ইবাদাত ও প্রার্থনা সম্পর্কে লক্ষ্য স্থির করতে বলা হয়েছে। ইবাদাতের লক্ষ্য নির্ভুল না হলে সমস্ত ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইবাদাতের লক্ষ্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগীর সামান্যতম অংশও যেন আল্লাহর ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। প্রকৃত মাবুদ ব্যতিত অন্য কারো প্রতি আনুগত্য, দাসত্ব, বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা যেন কোনক্রমেই মনে স্থান লাভ করতে না পারে। পথ-প্রদর্শন, সাহায্য ও মদদ লাভ এবং সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করতে হবে। কিন্তু ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনা করার পূর্ব শর্ত হলো, নিজের দীনকে পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

জীবনের গোটা ব্যবস্থা চলবে মানুষের বানানো মতবাদ-মতাদর্শ অনুসারে, রাজনীতি-অর্থনীতি পরিচালিত হবে ইসলাম বিরোধী শক্তির নির্দেশ অনুসারে, আল্লাহ্ বিরোধী নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা হবে, আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের দাসত্বের ভিত্তিতে জীবনের সমস্ত বিভাগ চলবে আর দোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দেয়া হবে, এ ধরনের ইবাদাত আর দোয়া-সাহায্য প্রার্থনার সামান্যতম কোন মূল্য নেই। আর এটাই হলো ইবাদাতের লক্ষ্য ভ্রষ্টতা। এ ধরনের দ্বিমুখী ইবাদাত করা আর আল্লাহর কাছে এভাবে সাহায্য চাওয়া, 'রাব্বুল আলামীন, আমরা তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, এই যমীন থেকে তোমার ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার কর্মসূচী ঘোষণা করেছি, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো-আমরা যেন আমাদের আন্দোলনে সফল হই'–সমান কথা।

সুতরাং ইবাদাত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে আল্লাহ। তাঁরই ইবাদাত ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। মানুষ যে কোন কাজে সফল হবার পূর্বে প্রথমে তার টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করে। পৃথিবীতে কোন কাজে সফলতা অর্জন করতে হলেও সর্বপ্রথমে টার্গেট নির্ধারণ করতে হয়। টার্গেট নির্ধারণ বা লক্ষ্য স্থির না করলে কোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায় না। দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য, পূজা-উপাসনা, দোয়া প্রার্থনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে, আমি কার দাসত্ব করবো এবং কার কাছে সাহায্য চাইবো। মুসলমান নামাজে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে এ কথারই স্বীকৃতি দেয়, আমি লক্ষ্য স্থির করেছি–আমার দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনা হবে একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবো এবং যে কোন প্রয়োজন একমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো।

নামাজে এভাবে বলা হলো, আর কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্যের জন্য, সন্তান লাভের আশায়, চাকরী লাভের আশায়, ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য, নির্বাচনে বিজয়ের লক্ষ্যে ছুটে গেল মাজারে, পীর-মাওলানা, জ্যোতিষী-গণকদের কাছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, এদের ইবাদাত ও সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে কোন লক্ষ্য স্থির নেই–এরা লক্ষ্যভ্রষ্ট। অর্থাৎ কে যে এদের মাবুদ, এরা কার ইবাদাত করবে এবং কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, সে ব্যাপারে এরা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়ের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে থাকে। এ ধরনের লক্ষ্যহীন লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ
اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَه وَيَخَافُوْنَ عَذَابَه–

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না। এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রব-এর নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রাহ্মতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫৬-৫৭)

ইবাদাত ও দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে মানুষ যখন লক্ষ্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। ক্ষণকালের জন্য আল্লাহর গোলামী

করে, আবার পীর-অলী, মাজারের গোলামী করে, জ্বিনের গোলামী করে, নেতা-নেত্রীর গোলামী করে তথা অসংখ্য মাবুদের গোলামী করতে থাকে। এরা যাদের কাছে সাহায্য চায়, যাদেরকে এরা নিজেদের আশাপূরণকারী বলে মনে করে, তারা নিজের অজান্তেই এদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ্ বলেন, এদের এসব মাবুদ কোন ক্ষমতাই রাখে না। এরা নিজেরাই তো আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সত্য পথের সন্ধানে রয়েছে। এরা আমার ভয়ে থরথর করে আর আমার রাহ্মত লাভের প্রত্যাশায় প্রহর অতিবাহিত করছে। সুতরাং একমাত্র আমারই দাসত্ব করো এবং আমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো।

অতএব ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা ও আনুগত্য করার পূর্বে লক্ষ স্থির করতে হবে যে, প্রকৃতই মাবুদ, ইলাহ ও রব কে? আমি কার ইবাদাত করবো, কে আমার দাসত্ব লাভের অধিকারী, আমার আনুগত্যের লক্ষ্য কোন শক্তি, কে আমার প্রার্থনা কবুল করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করে তারপর নিজেকে ইবাদাতে নিয়োজিত করতে হবে এবং সাহায্যের আশায় প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে লক্ষ্য স্থির করলেই, 'আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই'–নামাজে সূরা ফাতিহায় বলা কথাটি মুসলমানের জীবনে সফলতা ও সার্থকা বয়ে আনবে।

ইবাদাতের লক্ষ্য হবেন একমাত্র আল্লাহ্

মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং তিনিই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক। এই মানুষ কার দাসত্ব করবে, কোন শক্তিকে লক্ষ্য করে মানুষ ইবাদাত করবে–এ সিদ্ধান্ত কোন মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। যিনি মানুষে স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, তিনিই কেবল সিদ্ধান্ত জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করেন, তাঁর সৃষ্টি মানুষ কার আনুগত্য, ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সে সিদ্ধান্ত অনুগ্রহ করে পবিত্র কোরআনে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব-এর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা। (সূরা আল বাকারা-২১)

দাসত্ব ও আনুগত্যের একমাত্র লক্ষ্য হবেন আল্লাহ–তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে, আনুগত্যের মস্তক একমাত্র তাঁর সামনেই নত করে দিতে হবে। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে কোন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা যাবে না। সূরা নেছায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا–

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অকল্যাণের ভয়ে–কল্যাণের আশায় লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ যাদের আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, তাদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا–

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার ? (মায়িদা-৭৬)

সমগ্র সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণ করছেন আল্লাহ, এ ব্যাপারে অন্য কোন শক্তির সামান্য কোন ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না। তিনিই রব্ব এবং ইলাহ–দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, আল্লাহ আনুগত্যের যে স্বভাব মানুষের ভেতরে দান করেছেন, তা যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় এবং মানুষ যেন ইবাদাতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই লক্ষ্য স্থির করে, সে জন্য বলে দেয়া হয়েছে– ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ–لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ–
এই হচ্ছেন আল্লাহ–তোমাদের রব–তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা সুতরাং তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। (সূরা আন'আম-১০২)

ইবাদাত বা দাসত্ব করার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষগুলো অসংখ্য কল্পিত মাবুদের বন্দেগী করে থাকে। নির্জীব পদার্থসমূহকে তারা শক্তির প্রতীক কল্পনা করে পূজা আরাধনা করে থাকে। কেউ কল্পনা করেছে স্বয়ং স্রষ্টার সন্তান রয়েছে, ফেরেশতারা তার কন্যা, সৃষ্টি কাজে জ্বিন ও ফেরেশ্‌তাগণ অংশীদার, অতএব এসবের পূজা অর্চনা করতে হবে। কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে অন্যান্য জাতিকে নবী-রাসূলগণ ইবাদাত করার ব্যাপারে যে লক্ষ্য স্থির করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ

করেছিলেন, তারা কালক্রমে নিজেদের সেই লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে কেউ হযরত উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আবার কেউ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র হিসাবে কল্পনা করেছে। এভাবে তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এদের ইবাদাতের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلهًا وَّاحِدًا-لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَ-سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ-

অথচ এদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই বন্দেহী-দাসত্ব লাভের অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে।

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। মানব জাতির পিতা প্রথম মানব আদমের মধ্যে ইবাদাত, বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে কোন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তিনি তার ইবাদাতের লক্ষ্য সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। সমগ্র মানবতার জন্যেও সেই একই লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তী কালে এই মানুষ সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ هذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً-وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ-وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ-

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃত পক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব্ব। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো। কিন্তু নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্য লোকজন পরস্পরের মধ্যে নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

এই আয়াতে তোমরা শব্দের মাধ্যমে পৃথিবীর সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হে মানব গোষ্ঠী! তোমরা সবাই প্রকৃতপক্ষে একই দল ও একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাঁরা একই আদর্শ ও জীবন বিধানসহ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের সবারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, কেবলমাত্র এক ও একক আল্লাহই মানুষের রব এবং এক আল্লাহরই ইবাদাত, দাসত্ব, বন্দেগী, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনা করতে হবে। পরবর্তী কালে

ধর্মের নামে যেসব বিকৃত আদর্শ, মতবাদ ও মতাদর্শ তৈরী হয়েছে, তা সমস্ত নবী-রাসূলদের আনিত অভিন্ন আদর্শকে বিকৃত করে তৈরী করা হয়েছে। কোন চিন্তানায়ক নবীদের আদর্শের একটি দিক মাত্র নিয়েছে, কেউ দুটো দিক গ্রহণ করেছে আবার কেউ গুটিকতক নিয়ে তার সাথে নিজের চিন্তা-চেতনা মিশ্রিত করে কিম্ভূতকিমাকার একটা কিছু নির্মাণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছে।

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নানা ধর্মমতের এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে নানা জনগোষ্ঠীতে। বর্তমানে মানুষের তৈরী করা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের ভিত্তি দান করেছেন এবং নবী-রাসূলগণই মানুষকে নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন, এসব কথা ছড়িয়ে মূলতঃ পবিত্র নবী-রাসূলদের ওপরে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে।

এসব বিকৃত আদর্শ ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং ইবাদাতের ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করছে বলেই এ কথা প্রমাণ হয় না যে, বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় বিভিন্নতা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র নবী রাসূলদেরই সৃষ্টি। এসব কথা বলা ও এসব কথা বিশ্বাস করা বড় ধরনের অপরাধ। আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ একের অধিক কোন মতবাদ মতাদর্শ প্রচার করেননি এবং ইবাদাত, দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিলেন না। তাঁরা সবাই এক আল্লাহরই ইবাদাত করার আদেশ দান করেছেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই লক্ষ্যেই আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত করেছেন।

একমাত্র আল্লাহ্-ই ইবাদাত লাভের অধিকারী

একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত, দাসত্ব ও বন্দেগী করা জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতিরই দাবী। মানুষের সৃষ্টি ও তার প্রতিপালনের ব্যাপারে যাদের কোনই ভূমিকা নেই এবং থাকতে পারে না, তাদের ইবাদাত করা মূর্খতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক। মানুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই বন্দেগী করবে এটাই হলো যুক্তি ও বিবেকের দাবী। বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত মালিক ও শাসনকর্তাই হলেন আল্লাহ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত মা'বুদ। তিনিই প্রকৃত মা'বুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মা'বুদ হওয়া উচিত।

রব অর্থাৎ মালিক, মুনিব, শাসনকর্তা এবং প্রতিপালক হবেন একজন আর ইলাহ্ অর্থাৎ আনুগত্য, বন্দেগী ও দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হবেন অন্যজন,

এটা একেবারেই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধির অগম্য যুক্তি। মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার কল্যাণ ও অকল্যাণ, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হওয়া, তার ভাগ্য ভাঙা-গড়া, তার নিজের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বই যার ক্ষমতার অধীন–তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁরই সামনে আনুগত্যের মাথানত করা মানুষের প্রকৃতিরই মৌলিক দাবী। এটাই তার ইবাদাত তথা দাসত্বের মৌলিক কারণ। মানুষ যখন একথাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, ক্ষমতার অধিকারীর ইবাদাত বা দাসত্ব না করা এবং ক্ষমতাহীনের আনুগত্য বা ইবাদাত করা দুটোই জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির সুস্পষ্ট বিরোধী।

কর্তৃত্বশালী–ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগকারী আনুগত্য, দাসত্ব বা ইবাদাত লাভের অধিকারী হন। যাদের কোন ক্ষমতা নেই, কর্তৃত্ব নেই, কোন কিছু করার স্বাধীন ক্ষমতা নেই, তারা আনুগত্য বা দাসত্ব লাভের অধিকারী হন না। এসব দুর্বল সত্তার দাসত্ব বা আনুগত্য করে এবং তাদের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে শুধু নিরাশই হতে হয়–কিছু পাওয়া যায় না। কারণ একজন ভিখারী আরেকজন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে পারে না। মানুষের কোন আবেদনের ভিত্তিতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন ক্ষমতাই দুর্বল সত্তাদের নেই।

এদের সামনে বিনয়, দীনতা ও কৃতজ্ঞতা সহাকরে মাথানত করা এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করা ঠিক তেমনিই নির্বুদ্ধিতার কাজ, যেমন কোন ব্যক্তি শাসনকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে আবেদন পেশ করার পরিবর্তে তারই মতো অন্য আবেদনকারীগণ সেখানে আবেদন-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কারো সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা।

দাসত্ব লাভ ও প্রার্থনা মঞ্জুর করার একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধু পৃথিবী সৃষ্টিই করেননি, বরং তিনিই এর সব জিনিসের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন তাঁর সৃষ্টি করার কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছে তেমনি তাঁর টিকিয়ে রাখার কারণেই টিকে আছে। তাঁর প্রতিপালনের কারণেই সমস্ত কিছু বিকশিত হচ্ছে এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের অসীম কল্যাণে তা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে– لَه مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। পৃথিবী ও আকাশের ভান্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। (সূরা আয যুমার-৬৩)

যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক, প্রতিপালক এবং যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর চাবিকাঠি, তাঁরই ইবাদাত লাভের যোগ্যতা রয়েছে, আর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাদের ইবাদাত করছে, তারা সবই ঐ আল্লাহরই গোলাম। গোলাম হয়ে যারা গোলামদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূর্খ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ–

এদেরকে বলে দাও, হে মূর্খেরা, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে ? (সূরা যুমার-৬৪)

মহান আল্লাহর ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র অধিকারী–প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং এ জন্যই তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ–

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যেসব মানুষ অহঙ্কার বশতঃ আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মু'মিন-৬০)

নামাজ আদায় কালে মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে নিজেকে নিবেদন করে বলে, 'আমরা একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে আমরা তোমারই কাছে দোয়া করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই–অন্য কারো কাছে নয়। আসলে মানুষ দোয়া করে কেবল সেই শক্তিরই কাছে, যে শক্তি সম্পর্কে সে ধারণা করে, 'আমি যার কাছে দোয়া করছি, তিনি সমস্ত কিছুই শোনেন–দেখেন এবং অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। নীরবে-সরবে, নির্জনে, প্রকাশ্যে, মনে মনে যে কোন অবস্থায়ই দোয়া করি না কেন, তিনি তা দেখছেন এবং শুনছেন।' মূলতঃ মানুষের আভ্যন্তরীণ এই অনুভূতি, এই চেতনাই তাকে দোয়া করতে প্রেরণা যোগায়-উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই পৃথিবী তথা বস্তুজগতের প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ যখন মানুষের কোন দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট নিবারণ অথবা কোন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী

সত্তার কাছে ধর্ণা দেয়ার জন্য মানুষের অবচেতন মন অস্থির হয়ে ওঠে। বিষয়টি সে সময় মানুষের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখনই মানুষ দোয়া করে এবং সেই অদৃশ্য অথচ সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী সত্তাকে ডাকতে থাকে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি স্থানে এবং সর্বাবস্থায় ডাকে। নির্জনে একাকী ডাকে, উচ্চস্বরে ডাকে, নীরবে নিভৃতে ডাকে এবং মনে মনে একান্ত তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করে। একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মানুষ এভাবে তাঁর স্রষ্টাকে ডাকতে থাকে। সেই বিশ্বাসটি হলো, সে যে সত্তাকে ডাকছে, সেই সত্তা তাকে সর্বত্র সর্বাবস্থায় দেখছেন এবং তাঁর মনের গহীনে যে কথামালার গুঞ্জরণ সৃষ্টি হচ্ছে, সাহায্যের প্রত্যাশায় তার মন যেভাবে আর্তনাদ করছে, মনের জগতের এই আর্তচিৎকার পৃথিবীর কোন কান না শুনলেও তাঁর স্রষ্টার কুদরতী কান অবশ্যই শুনতে পাচ্ছে। সে যে সত্তাকে ডাকছে, তিনি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর কাছে প্রার্থনাকারী যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি তাকে সাহায্য কতে সক্ষম। তার বিপর্যস্ত ভাগ্যকে পুনরায় কল্যাণে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম।

আল্লাহর কাছে দোয়া করার, তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করার এই তাৎপর্য অনুধাবন করার পর মানুষের জন্য এ বিষয়টির মধ্যে আর কোন জটিলতা থাকে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া করে বা সাহায্যের আশায় ডাকে, তার নামে মানত করে সে প্রকৃত পক্ষেই নিরেট বোকা এবং সে নির্ভেজাল শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা সেসব সত্তার মধ্যেও রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে। আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলী নির্দিষ্ট, সে তাদেরকে ঐসব গুনাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক না করতো তাহলে তার কাছে দোয়া করতো না এবং সাহায্য চাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তার মনে কখনো উদয় হতো না।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কারো সম্পর্কে নিজের থেকেই এ কথা মনে করে বসে যে, সে অনেক প্রচন্ড ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক, তাহলে অনিবার্যভাবেই তার কল্পিত ব্যক্তি বা সত্তা ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হয়ে যায় না। ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের মালিক হওয়া একটি অবিচল বাস্তবতা, একটি দৃশ্যমান বাস্তব বিষয় যা কারো মনে করা বা না করার ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রকৃত ক্ষমতার মালিককে কেউ মালিক মনে করুক বা না করুক, স্বীকৃতি দিক বা না দিক—তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না, প্রকৃতই যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে মালিক,

সে সর্বাবস্থায়ই মালিক থাকবে। আর যে সত্তা কোন ক্ষমতার মালিক নয়, কেউ তাকে ক্ষমতার মালিক মনে করলেও, তার মনে করার কারণে সে সত্তা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতাবান হবে না।

এটাই অটল বাস্তবতা যে, একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্তাই সর্বশক্তিমান, গোটা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপক, শাসক, প্রতিপালক, সংরক্ষণকারী, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, তিনিই সামগ্রিকভাবে যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অধিপতি। সমগ্র বিশ্ব জগতে দ্বিতীয় এমন কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই, যে সত্তা দোয়া শোনার সামান্য যোগ্যতা রাখে, সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে, বা তা মঞ্জুর করা বা না করার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষ যদি এই অটল বাস্তবতার পরিপন্থী কোন কাজ করে নিজের পক্ষ থেকে নবী-রাসূল, পীর-দরবেশ, অলী-মাওলানা, জ্বিন-ফেরেশতা, গ্রহ-উপগ্রহ ও মাটির তৈরী দেব-দেবীদেরকে ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের অংশীদার কল্পনা করে, তাহলে প্রকৃত বাস্তবতার কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটবে না। ক্ষমতার অধিকারী মালিক যিনি–তিনি মালিকই থাকবেন, তাঁর মালিকানায় এসব ব্যর্থ ও বাস্তবতা বর্জিত কল্পনা বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। আর নির্বোধদের কল্পনা শক্তি কখনো ক্ষমতা ও ইখতিয়ারহীন গোলামকে মালিক বানাতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে।

দোয়া করা ও সাহায্য কামনা করার বিষয়টি সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। মনে করা যাক কোন রাজার দরবার থেকে সাহায্য দান করা হয় এবং রাজা প্রার্থনা শুনে থাকেন। সেখানে প্রজাদের মধ্য থেকে যার যে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে অনেকেই উপস্থিত হয়েছে। এই প্রজাদেরই একজন যদি সাহায্যের আবেদন নিয়ে রাজার দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে–সাহায্য প্রত্যাশী অন্য প্রজাদের একজনের সামনে দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে তার গুণকীর্তন করতে থাকে এবং সাহায্যের জন্য তার কাছে কাতর কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করতে থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির এই ধরনের আচরণকে কি বলা যেতে পারে? এর থেকে চরম ধৃষ্টতা কি আর হতে পারে?

বিষয়টি আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক, রাজার দরবারে রাজার উপস্থিতিতে তারই একজন প্রজা আরেকজন প্রজাকে রাজা কল্পনা করে তার কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছে, সাহায্য প্রার্থনা করছে, রাজার মধ্যে যেসব গুণাবলী রয়েছে তা ঐ প্রজা সম্পর্কে উল্লেখ করে তার কাছে সাহায্য চাচ্ছে। আর যে প্রজার কাছে এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, সেই প্রজা বেচারী রাজার সামনে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে

পড়ছে, বিব্রতবোধ করছে এবং বারবার নির্বোধ প্রজাকে বলছে, 'তুমি আমার গুণকীর্তন কেন করছো, আমার কাছে কেন দোয়া করছো, কেন আমার কাছে সাহায্য চাচ্ছো, আমি তো রাজা নই–তোমার মতো আমিও এই রাজার একজন প্রজামাত্র এবং রাজ দরবারে তোমার মতো আমিও একজন সাহায্য প্রার্থী। আমাকে বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যে আসল রাজা দরবারে অধিষ্ঠিত আছেন, সাহায্য তার কাছে চাও।' বেচারী এভাবে ঐ নির্বোধ প্রজাকে বার বার বুঝাচ্ছে, কিন্তু কে শোনে কার কথা! হতভাগা তবুও চোখ-কান বন্ধ করে তারই মতো সেই প্রজার কাছে স্বয়ং রাজার সামনে সাহায্য প্রার্থনা করেই যাচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হয়েছে ঐ নির্বোধ হতভাগা প্রজার মতোই। আল্লাহর যেসব বাকহীন গোলামদের দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, পূজা-উপাসনা এরা করছে, তারা নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে, 'আমরা তোমারই মতো এক গোলাম। আমাদের আনুগত্য না করে, আমাদের কাছে প্রার্থনা না করে, আমরা যার আনুগত্য করছি, যার কাছে সাহায্য কামনা করছি, সেই আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাও।'

দোয়া–দাসত্বের স্বীকৃতি

দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহর এবং যে কোন প্রয়োজনে তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। দোয়া করতে হবে শুধু তাঁরই কাছে। মনে রাখতে হবে, দোয়াও ঠিক ইবাদাত তথা ইবাদাতের প্রাণ। আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য ও পূজা-উপাসনারই অনিবার্য দাবী। যারা তাঁর কাছে দোয়া করে না, এর অর্থ হলো–তারা গর্ব আর অহঙ্কারে নিমজ্জিত। এ কারণে তারা নিজের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে দাসত্বের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছে দোয়া না করা, সাহায্য না চাওয়া চরম অপরাধ। হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়াই ইবাদাত। আরেক হাদীসে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের সারবস্তু। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রদ্ধ হন। (তিরমিজী)

দোয়া ও তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি

দোয়া বা সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক মানুষ ধারণা করে, 'কল্যাণ ও অকল্যাণ যাবতীয় কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনিই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে যে ফায়সালা করেছেন সেটাই তো অনিবার্যভাবে মানুষের জীবনে ঘটবেই। অতএব নতুন করে আবার আমরা দোয়া করবো কেন এবং দোয়া করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে ?' মানুষের এই ধারণা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দোয়ার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। এই ভুল ধারণা হৃদয়-মনে পালন করে মানুষ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, দোয়া করে, তাহলে সেসব দোয়ার মধ্যেও যেমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না তেমনি কোন প্রাণও থাকে না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা মু'মিনের ৬০ নং আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন−

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ-

তোমাদের রব বলেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো।

এভাবে পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই বলা হয়েছে, আমি বান্দার অত্যন্ত কাছে অবস্থান করি, বান্দাহ্ যখন আমাকে ডাকে আমি সে ডাকের সাড়া দিয়ে থাকি। কোরআনের এসব ঘোষণা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার দোয়া ও আবেদন, নিবেদন ও কাকুতি-মিনতি শুনে আল্লাহ্ নিজে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ কথা চিরসত্য যে, বান্দাহ্ আল্লাহর সিদ্ধান্তসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না বা তাঁর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সামান্যতম ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন।

সুতরাং দোয়া কবুল হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় দোয়ার অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কোন দোয়া-ই বৃথা যায় না। একটি না একটি কল্যাণ অবশ্যই লাভ করা যায়। সে কল্যাণের ধরণ হলো, বান্দাহ্ তার মালিক, মনিব, প্রভু, প্রতিপালকের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজন পেশ এবং দোয়া করে, সাহায্য কামনা করে তাঁর প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয় এবং নিজের দাসত্ব ও অক্ষমতা, অপারগতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করে। নিজের দাসত্বের এই স্বীকৃতিই যথাস্থানে একটি ইবাদাত বা

ইবাদাতের প্রাণসত্তা। বান্দাহ্ যে সাহায্য কামনা করলো বা যে উদ্দেশ্যে দোয়া করলো সেই বিশেষ জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, তার আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দোয়ার প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–لايرد القضاء الا الدعاء–দোয়া ব্যতীত আর কোন কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোন কিছুর মধ্যেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা তখনই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দোয়া করে, সাহায্য চায়। তিরমিজী শরীফের আরেকটি হাদীসে এসেছে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سآل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع با هم او قطيعة رحم–

বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন–যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না করে।

মুছ্নাদে আহ্মাদে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما من مسلم يدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلث–اما ان يعجل له دعوته–واما ان يد خرها له فى الا خرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها–

একজন মুসলমান যখনই কোন দোয়া করে তা যদি কোন গোনাহ্ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তা তিনটি অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দোয়া এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয় তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার ওপরে ঐ

পর্যায়ের কোন বিপদ আসা বন্ধ করা হয়।' বোখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شيئت-ارحمنى ان شئت-ارزقنى ان شئت-وليغزم مسئلته-

তোমাদের কোন ব্যক্তি দোয়া করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিযিক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ আল্লাহ ! আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন–তিনি এভাবে আদেশ দিয়েছেন– ادعوا الله وانتم موقنون بالا جابة আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়া করো।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يستجاب للعبد مالم يدع باثم اوقطيعة رحم مالم يستعجل - قبل يارسول الله ما الاستعجال-قال يقول قد دعرت وقد دعوت فلم اريستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দোয়া না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! তাড়াহুড়োর বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়ো হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, কিন্তু দেখছি আমার কোন দোয়াই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসন্নগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা থেকে বিরত থাকে।

তিরমিজী শরীফে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

يسأل احدكم ربه حاجته كله حتى يسأل شسع نعله اذا انقطع-

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত তার রব্ব-এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।

তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফের হাদীস–হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

ليس شيئ اكرم على الله من الدعاء আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর কিছুই নেই।

তিরমিজী ও মুছ্নাদে আহ্মদ শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে উমর ও মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন–

ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء যে বিপদ আপতিত হয়েছে তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার ব্যাপারেও দোয়া উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দোয়া করা কর্তব্য।

তিরমিজীর আরেকটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবনে মাস্উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

سلوا الله مفضله فان الله يحب ان يسأل-

আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।

দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে, সাহায্য চাইতে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে এমন অনেক দোয়া রয়েছে। মানুষ যে বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বলে ধারণা করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ বা কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। কারণ, কোন বিষয়ে মানুষের কোন চেষ্টা-সাধনা-তদবীরই

আল্লাহর রহমত, তাঁর সহযোগিতা ও তাওফিক এবং সাহায্য ব্যতিত সফল হতে পারে না। চেষ্টা-সাধনা শুরু করার পূর্বে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার অর্থ হলো, বান্দাহ্ সর্বাবস্থায় তার নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করছে। সে যে আল্লাহর বান্দাহ্, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব, আনুগত্য, বন্দেগী, ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করছে এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর কল্পনাতীত ক্ষমতা, সম্মান-মর্যাদার কথা দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই কথাগুলোই সূরা ফাতিহার মধ্য দিয়ে বান্দাহ্ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামাজে বারবার বিনয়ের সাথে বলতে থাকে, হে আল্লাহ ! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি।

যে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখন মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহকে সেজদা দেয়, তখন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং কোন কিছুর প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সম্রাট শাহ্জাহানের জীবনীর মধ্যে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কোন একজন ভিক্ষুক কিছু পাবার আশায় তার দরবারে আগমন করেছিল।

অভাবী লোকটি সম্রাটকে না পেয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলো, তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করছেন। লোকটি মসজিদের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলো, দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট শাহ্জাহান নামাজ শেষে দুটো হাত তুলে আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করছেন, আর তার দু'চোখের কোণ বেয়ে শ্রাবণের বারি ধারার মতই অশ্রু ঝরছে। অশ্রু ধারায় তার দাড়ি সিক্ত হয়ে বুকের কাছে শরীরের জামাও ভিজে গিয়েছে।

মুনাজাত শেষ করে সম্রাট মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। ভিক্ষুক লোকটি সম্রাটকে সালাম জানালো, তিনি সালামের জবাব দিলেন। এরপর লোকটি সম্রাটের কাছে কোন কিছু আবেদন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে চলে যেতে লাগলো। সম্রাট অবাক হলেন। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, তার কাছে এসে কেউ তো কোন নিবেদন না করে ফিরে যায় না-কিন্তু এ লোকটিকে দেখতে তো অভাবী মনে হয়। কিন্তু লোকটি কিছু না চেয়ে ফিরে যাচ্ছে কেন? ভিখারী লোকটি চলে যাচ্ছে আর

সম্রাট বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি লোকটিকে ডাক দিলেন। লোকটির কানে সম্রাটের আহ্বান পৌঁছা মাত্র লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে সম্রাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষমতাধর সম্রাট লোকটির চোখের ওপরে চোখ রেখে মমতাভরে প্রশ্ন করলেন, আমার কাছে এসে কোন ব্যক্তি কিছু না চেয়ে তো চলে যায় না, তোমাকে দেখে তো অভাবী মনে হচ্ছে। তুমি আমার কাছে কিছু না চেয়ে কেন চলে যাচ্ছিলে ?

লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে জানালো, সত্যই আমি অভাবী। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি। আপনার কাছেও এসেছিলাম ভিক্ষার আশায়। আপনার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু সাহায্য পাবো, যেন বাকি জীবনে আমাকে আর ভিক্ষা করতে না হয়। কিন্তু আপনার কাছে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। আমি দেখলাম, আপনি আমার থেকে নগণ্য ভিক্ষুকের মতো পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটদের সম্রাটের কাছে দু'হাত তুলে ভিখারীর মতো অনুনয়-বিনয় করে কাঁদছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলা, সম্রাট কাঁদে যে সম্রাটের কাছে, আমিও তাঁরই কাছে কাঁদবো। আমি বাকি জীবনে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্ ব্যতিত আর কারো কাছে কখনো কিছুই চাইবো না।

আনুগত্য বনাম ইবাদাত

পবিত্র কোরআনে ইবাদাত শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। নামাজের মধ্যে বারবার পড়তে হয়–ইয়্যাকা না'বুদু-অর্থাৎ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, এই আয়াতে যে না'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আনুগত্য অর্থে ইবাদাত শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখন আমরা তা দেখার প্রয়াস পাবো। সূরা ইয়াছিনের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ–

হে আদম সন্তানেরা ! আমি কি তোমাদের তাগিদ করিনি যে তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াছিন-৬০)

এই পৃথিবীতে বোধহয় এমন একজন মানুষও অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি শয়তানকে ভালো বলে। সবাই শয়তানকে গালাগালি দেয়। কোন মানুষের

দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হলে, অন্য মানুষ তাকে শয়তান বলে গালি দেয়। এভাবে শয়তানের প্রতি সবাই অভিশাপ দিয়ে থাকে। শয়তানকে মানুষ অভিশাপ দেয়–কেউ তার ইবাদাত করে না।

শয়তানের পূজা-উপাসনা, ইবাদাত, বন্দেগী, আনুগত্য করতে কেউ রাজি হয় না–এর পরিবর্তে শয়তানের ওপরে শুধু চারদিক থেকে অগণিত কণ্ঠে অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে। শয়তান নামক এই অশুভ-অপশক্তির প্রতি লা'নত হতে থাকে। মানুষ অপরাধ করে, পাপের সাগরে ডুবে যায়, পাপ-পঙ্কিলতার কদর্যতায় অবগাহন করতে থাকে মানুষ আর দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের ঘাড়ে। মানুষের এই স্বভাব দেখে কবি বলেন–

কিয়া হাঁসি আ-তি হায় মুঝে হযরতে ইনছান প্যর
ফেলে বদ তু খোদ ক্যরে লা'নাত ক্যরে শয়তান প্যর।

বিদ্রুপের হাসি আসে আমার, মানুষের স্বভাব দেখে। এরা নিজেরা অপরাধমূলক কর্ম করে দোষ চাপিয়ে দেয় শয়তানের প্রতি।

এই শয়তান যেন ফুটবলের মতো। ফুটবলের সৃষ্টিই হয়েছে লাথির আঘাত সহ্য করার জন্য, তেমনি এই শয়তানের সৃষ্টিই হয়েছে শুধু অভিশাপ, লা'নত আর গালাগালি শোনার জন্য। অথচ এই মানুষের প্রতি তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে বার বার আদেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না। শয়তানের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে–এ কথার অর্থ হলো, শয়তান যা বলে তা করা যাবে না। শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা যাবে না। এই অপশক্তির আনুগত্য করা যাবে না। কোরআন ও হাদীসের আদেশ অনুসরণ করার পরিবর্তে শয়তানের আদেশ অনুসারে জীবন পরিচালিত করা যাবে না। শয়তান মানুষকে যেভাবে প্ররোচনা দেয়, সেই প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার অর্থই হলো, শয়তানের ইবাদাত করা বা শয়তানের আনুগত্য করা। সূরা ইয়াছিনের উল্লেখিত আয়াতে যে তা'বুদু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ হলো আনুগত্য করা, দাসত্ব করা বা ইবাদাত করা। যারা পৃথিবীতে শয়তানের ইবাদাত করেছে তথা শয়তানের প্ররোচনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে,–

اُحْشُرُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ–

পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান এবং অন্য সত্তাদের আনুগত্য করেছে, তাদের সবাইকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (কোরআন)

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব, আনুগত্য বা ইবাদাত না করে, শয়তানের আনুগত করেছে, ইবাদাত করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ শয়তানের ইবাদাত বা আনুগত্য করার নির্মম পরিণতি এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এ কারণে যে, মানুষ যেন কোনক্রমেই শয়তানের আনুগত্য না করে। মানুষ আনুগত্য করবে কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং তাঁর প্রেরিত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। শর্তহীনভাবে কোন নেতা-নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। কারো আনুগত্য করতে হলে, কারো মতামত গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই কোরআন সুন্নাহ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ–وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا–لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ–سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ব্যতিত আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, সেই আল্লাহ–যিনি ব্যতীত অন্য কেউ দাসত্ব লাভের অধিকারী নন। (সূরা তওবা-৩১)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরকে রব্ব বানিয়ে নেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করে, তাদের আনুগত্য করা। এসব ব্যক্তিদের আদেশ-নিষেধ নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা। আল্লাহর বিধান অনুসন্ধান না করে, পীর, মাশায়েখ, আলেম-ওলামাদের মতামত অনুসরণ করা। হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টের বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। উল্লেখিত আয়াত প্রসঙ্গে তিনি জানতে চান, 'আমরা খৃষ্টানরা আমাদের আলেম-ওলামা ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিলাম বলে কোরআন যে অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে, এর

প্রকৃত অর্থ কি?' জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের আলেম-ওলামা, দরবেশগণ যে বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা দিত তা তোমরা অবৈধ হিসাবে গণ্য করতে?' হযরত আদী বললেন, 'হ্যাঁ-অবশ্যই আমরা তা করতাম।'

হযরত আদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জবাব শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-এ ধরনের করলেই তো তাদেরকে রব বানিয়ে নেয়া হলো। উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতিতই যারা মানব জীবনের জন্য হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধের সীমা নির্ধারণ করে, আসলে তারা নিজেদের ধারণা অনুসারে নিজেরাই রব-এর আসন দখল করে বসে।

আর যারা তাদেরকে এভাবে আইন-বিধান রচনা করার অধিকার দেয় বা অধিকার আছে বলে মেনে নেয়, মূলতঃ তারাই তাদেরকে রব্ব বানায়। আলেম-ওলামা, পাদ্রী-পুরোহিতদের রব বানিয়ে নেয়ার মূল অর্থ হলো, তাদেরকে আদেশ-নিষেধকারী হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন ব্যতীতই তাদের কথা শিরোধার্য করে নেয়া হয়েছে।

আলেম-ওলামা, পীর-দরবেশ, ওস্তাদ-মাশায়েখ, নেতা-নেত্রী তথা যে কোন ব্যক্তি হোক না কেন, তিনি যে কথাটি বলবেন-সে কথার প্রতি কোরআন ও হাদীস সমর্থন করে কিনা, তা না জেনে কোনক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না। পীর সাহেব বা কোন মাওলানা সাহেব যদি বলেন, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতে হবে পনের হাত। শুধু পনের হাত কেন, এর অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে-কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কোন সাহাবা এ ধরনের বিশালাকৃতির কোন পাগড়ী ব্যবহার করেছেন কিনা।

পীর সাহেব শিখিয়ে দিলেন, এই ধরনের পদ্ধতিতে সকাল-সন্ধ্যায় বা গভীর রাতে যিকির করতে হবে। যিকির অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু প্রথমে এটা অনুসন্ধান করতে হবে, পীর সাহেব যে পদ্ধতিতে করতে বললেন, সে পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূল বা তাঁর কোন সাহাবা জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যিকির করেছেন কিনা। যদি দেখা যায় তাঁরা করেছেন, তাহলে পীর সাহেবের কথার প্রতি আনুগত্য করা যেতে পারে-তার পূর্বে নয়।

একজন মাওলানা সাহেব ফতোয়া দিলেন, তার সে ফতোয়া কোরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা-এটা সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। কোন হুজুর,

কোন পীর সাহেব, কোন মুরুব্বী কি বলেছেন, কোন কিতাবে কি লেখা রয়েছে–এসব অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন মুসলমানদের নেই। মুসলমানদের অনুসরণ করার প্রয়োজন, একমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ। এ দুটো ব্যতিত অন্য কোন কিতাবের কথা, কোন ব্যক্তির কথা অনুসরণ করা যেতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির কথা ও কিতাবের লেখার সাথে কোরআন-সুন্নার বিধানের সংঘর্ষ না ঘটে, তাহলে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর নামই হলো আনুগত্য এবং আল্লাহর ইবাদাত। কোরআন-সুন্নাহ অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোন কিছুর অন্ধ অনুকরণ করা যাবে না–এর নামই হলো ইবাদাত। কেবলমাত্র চোখ বন্ধ করে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথানত করতে হবে, আনুগত্য করতে হবে।

পূজা বনাম ইবাদাত

এই পৃথিবীতে কোন মানুষকে বা জড়-অজড় পদার্থকে ক্ষমতার উৎস মনে করে বা ক্ষমতাশালী মনে তার কাছে দোয়া করা, প্রার্থনা করা, নিজের দুঃখমোচনের লক্ষ্যে তাকে ডাকা, যেমনভাবে আল্লাহকে ডাকা উচিত, নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের আশায়, বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায় ডাকা পূজার অন্তর্ভুক্ত এবং সম্পূর্ণ শিরক। কাউকে সম্মান প্রদর্শের উদ্দেশ্যে রুকু সিজদা করা, তার সামনে দু'হাত বেঁধে দাঁড়ানো, কোন মাজার বা কবরে তাওয়াফ করা, কোন আস্তানায় চুমো দেয়া, কারো সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন দেয়া, কোরবানী করা এবং এ জাতিয় যে কোন অনুষ্ঠান করা–যা সাধারণতঃ পূজার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, এসবই হলো শির্ক।

কারণ পূজা-উপাসনা লাভের অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। নিজের যে কোন প্রয়োজনের জন্য একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। সূরা মুমিনে আল্লাহ বলেন–

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَ
نِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ–وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ–

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার কাছে আমার রব্ব-এর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রব-এর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।

এ আয়াতে ইবাদাত ও দোয়াকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নবীর মাধ্যমে এ কথা বলে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পূজা করা ত্যাগ করে যাদের পূজা করছো, যাদের সামনে পূজা-উপাসনা করছো, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আমি যেন তাদের পূজা-উপাসনা না করি। এ ব্যাপারে আমার কাছে আমার রব-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার মাথা বিনয়ের সাথে একমাত্র তাঁরই সামনে নত করি, যিনি গোটা জাহানের রব্ব এবং তাঁরই সামনে সমস্ত সৃষ্টি আনুগত্যের মস্তক নত করে দিয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিলোক তাঁরই পূজা-উপাসনা করছে।

এভাবে যেসব মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যাদের পূজা-উপাসনা করে থাকে, এরা হলো সবচেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَه اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ–وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ–

সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট কে–যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর শত্রু হয়ে যাবে এবং ইবাদাতকারীদের অস্বীকার করবে। (সূরা আহ্কাফ-৫-৬)

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মানুষ মাজারে গিয়ে মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের কাছে, মূর্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, নানা আশাপূরণ করার জন্য দেয়া করে, এসব লোক হলো পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে অগ্রগামী দল। মাজারে গিয়ে, দরগায় গিয়ে, মন্দিরে মূর্তির কাছে গিয়ে তাদেরকে উপাস্য তথা আশাপূরণকারী, সাহায্যদানকারী মনে করে যেসব নালিশ বা সাহায্য প্রার্থনা করে অথবা তাদের কাছে দোয়া করে, তারা আবেদনকারীর আবেদনে কোন প্রকার ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাস্তব তৎপরতা প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়। এসব আহ্বানকারীদের আহ্বান আদৌ তাদের কানে পৌঁছে না। এদের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, এরা নিজের কানে আদেবদনকারীর আবেদন শোনে বা এমন কোন সূত্র নেই, যে সূত্রে তারা অবগত হতে পারে যে, তাদের কাছে কেউ দোয়া করছে বা আবেদন করছে।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্য সত্তার কাছে আবেদন-নিবেদন করে, এসব স্বকপোলকল্পিত সত্তা সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়ে তাকে। প্রথম প্রকার হলো, একশ্রেণীর মানুষ যেসব মূর্তি নিজ হাতে নির্মাণ করে এদের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেয়। এদের কাছে মনের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা নিবেদন করে। এসব সত্তা প্রাণহীন জড়পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই এদের কোন শক্তিই নেই। আবেদনকারীর কোন আবেদন এদেরকে স্পর্শও করতে পারে না।

দ্বিতীয় যেসব সত্তার পূজা-অর্চনা, উপাসনা একশ্রেণীর মানুষ করে, তারা হলো সেই সব ব্যক্তি–যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী করে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা প্রতি নিয়ত সংগ্রাম-মুখর জীবন অতিবাহিত করতেন। এসব সম্মানিত ও মর্যাদাবান বুযর্গ লোকগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে একশ্রেণীর স্বার্থলোভী মানুষ এদের কবরকে ঘিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করে দিল এবং এসব লোক সম্পর্কে নানা ধরনের কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার কথা অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলো। যেন লোকজন এসব মাজারে এসে সাহায্য কামনা করে, বিপদ থেকে মুক্তি চায় এবং সেই সাথে উপহার-উপঢৌকন দেয়, অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকে। এসব বুযর্গ ব্যক্তিও আবেদনকারীর কোন আবেদন শুনতে পান না। কারণ তারা মৃত এবং মৃত লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى তুমি মৃত লোকদের কোন কথা শোনাতে পারবে না। (কোরআন)

আল্লাহর ওলীগণ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে আল্লাহর কাছে তারা এমন একটি জগতে অবস্থান করছেন, যেখানে কোন মানুষের আওয়াজ সরাসরি পৌঁছে না। কোন ফেরেশ্তার মাধ্যমে তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় না যে, 'আপনাদের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বা সেজদায় অবনত হয়ে লোকজন আপনার কাছে দোয়া কামনা করছে।' এসব সংবাদ এজন্য তাদেরকে দেয়া হয় না যে, তারা তাদের গোটা জীবনকাল ব্যাপী আন্দোলন করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, মানুষ যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কাছেই দোয়া প্রার্থনা করে। এখন যদি তারা জানতে পারেন যে, তিনি যেসব বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, মানুষ উল্টো তারই কবরকে কেন্দ্র করে ঐসব বিষয়

অনুষ্ঠিত করছে, তার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছে। তাহলে তারা মনোকষ্ট লাভ করবেন–আর আল্লাহ্ তাঁর কোন প্রিয় বান্দাকে সামান্য কষ্টেও নিক্ষেপ করেন না।

স্বার্থান্বেষী লোকগণ আল্লাহর ওলীদের মাজারকে কেন্দ্র করে শির্কের উৎসের স্থলে পরিণত করেছে। এসব লোকদের নামের পূর্বে 'পীর-মাওলানা' শব্দও ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই ধরনের পীর ও মাওলানা উপাধিধারী মাজার পূজারী লোকগণ নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে দল তৈরী করেছে। মানুষ যেন এদেরকে নবীর সুন্নাতের প্রকৃত অনুসারী মনে করে, এ জন্য তারা তাদের দলের নাম দিয়েছে, 'আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত।' অর্থাৎ এটা সেই দল–যে দল সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে।

মানুষের অর্থ-সম্পদ শোষনের লক্ষ্যে এরা সুন্নাতের নামাবলী গায়ে দিয়ে বলে থাকে, 'মাজারে যিনি শুয়ে আছেন, তিনি জীবিতকালে যতটা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, ইন্তেকাল করার পরে তার শক্তি আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি লাভ করেছে, কারণ এখন তো তারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে যাতায়াত করার অনুমতি পত্র লাভ করেছেন।'

এই সব স্বার্থান্বেষী কর্মবিমুখ-বিভ্রান্ত লোকজন, শ্রমলব্ধ উপার্জন কষ্টকর মনে করে অজ্ঞ মানুষের অর্থ হাতিয়ে নেয়ার কৌশল হিসাবে মাজারে বিশালাকৃতির বৃক্ষ তৈরী করেছে। লোকজনকে বলা হয়েছে, অমুক নির্দিষ্ট দিনে এসে এই বৃক্ষের গোড়ায় অমুক অমুক জিনিস উপহার দিয়ে গেলে মনের আশা পূরণ হবে। বৃক্ষের শাখায় কোন ভারী পাথর বা ইট বেঁধে দিলে গর্ভে সন্তান আসবে। এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে, পাথর বা ইট যেমন ওজনদার, তেমনি সন্তানের ভারে গর্ভ ভারী হবে, গর্ভ স্ফিত হয়ে উঠবে। মাজারের পাশে জলাশয় নির্মাণ করে সেখানে মাছ, কুমির, কাছিম ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান তথা ইবাদাত সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের ভেতরে এই ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে যে, এসব মাছ, কাছিম আর কুমিরকে খাদ্য প্রদান করলে, চুমো দিলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে, মনের আশা পূরণ হবে, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করবে। এভাবে মানুষকে আল্লাহর পূজা-অর্চনা ও উপাসনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে এবং শির্কে নিমজ্জিত করা হয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ্ মুখী না করে মাজার মুখী করা হয়েছে।

মারাত্মক বিভ্রান্তি

মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিরত করে এমন সব শক্তির ইবাদাত করার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যাদের কোনোই শক্তি নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ-

এবং তারা আল্লাহকে ত্যাগ করে এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করতে পারে না। আর বলে, এরা আল্লাহর দরবারে আমাদের সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুস-১৮)

যারা এ ধরনের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তারা বলে থাকে, আমরা এসব দরগাহ্ আর মাজারে এ জন্য প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর এসব ওলীগণ আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন এবং এরা হলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। পৃথিবীতে একটি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কোন একক ব্যক্তির পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনার জন্য মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওপরে নানা রকম দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তেমনি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এক একটি শক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমরা সেসব শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই তাদের পূজা-উপাসনা করি, তাদের দরবারে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করি।

উল্লেখিত ধারণা একটি ভয়ঙ্কর ধারণা। কোন মুসলমান যদি এমন ধারণা পোষণ করে, তাহলে সে আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর একজন থাকবে না। সরাসরি মুশরিক হয়ে যাবে। এরা মানুষের সীমিত ক্ষমতার মতো আল্লাহর ক্ষমতাকেও সীমিত মনে করে। মানুষ দুর্বল, তার ক্ষমতা সীমিত-এ জন্য মানুষ একা দেশের সমস্ত কাজের আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয় বলে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তো অসীম ক্ষমতার অধিকারী-সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর যে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চান, তাঁর সে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তিনি কুন বললেই তাঁর ইচ্ছা সাথে সাথে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় অন্য কোন শক্তির পূজা-উপাসনা করার কোনই প্রয়োজন নেই। সরাসরি তাঁরই পূজা-উপাসনা, আনুগত্য, বন্দেগী বা ইবাদাত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছুই করতে পারে না। কোন পীরের এমন ক্ষমতা নেই, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে কোন মানুষের দেহের একটি পশমের কোন ক্ষতি করতে পারে। এভাবে কোন দেব-দেবী বা অন্য কোন কল্পিত সত্তারও কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ–وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

কোন দুঃখ ও বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আনআ'ম-১৭)

মানুষের জীবনে যে কোন বিপদ আসে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। যখন কোন কল্যাণ আসে সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জন্য পূজা-উপাসনা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه اِلاَّ هُوَ–وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِه–يُصِيْبُ بِه مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِه–وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (সূরা ইউনুস-১০৭)

পবিত্র কোরআনের এসব আয়াত যেমন মূর্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য তাদের পীর, মাজার-দরগার ব্যাপারে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের জন্য যেসব কাজ নির্দিষ্ট রেখেছেন, সেসব কাজের ব্যাপারে কারো মধ্যে কোন ক্ষমতা বন্টন করেননি। তিনি কাউকে এজেন্সি দান করেননি যে, যে কেউ ইচ্ছা করলেই কোন নিঃসন্তানকে সন্তান দান করতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে বা কৃষিতে অধিক উৎপাদন করে দিতে পারে। ইবাদাতের ব্যাপারে কিছু

সংখ্যক মানুষের বিশ্বাস এতটা নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে যে, অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, সম্মান-মর্যাদা লাভের আশায় পীর সাহেবের পা ধোয়া পানি পর্যন্ত কেউ কেউ পান করে। পীর সাহেব গোসল করলে সেই গোসলের পানিও তারা পানা করে। এমনকি নিজের স্ত্রী ও কন্যাদেরকে পীর সাহেবের খেদমতে নিয়োজিত করা হয়। পীরের প্রতি এমন সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়, যে সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী হলেন আল্লাহ। পূজার মাধ্যমে পীরকে এরা আল্লাহর আসনে বসিয়েছে।

কোন পীরের এ ক্ষমতা নেই যে, তারা কোন তদবীর দিয়ে কাউকে দশতলার মালিক বনিয়ে দিবে, শিল্প কারখানার মালিক বানাবে। আল্লাহ যদি রাজি না থাকেন, তাহলে কারো ভাগ্য কেউ পরিবর্তন করে দিতে পারে না। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় তথাকথিত পীরকে পূজা করা শির্ক। এই শির্ক থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ-فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমাকে কোন উপকার করে দিতে পারে না, তোমার কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারে না। তুমিও যদি তাই করো তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস-১০৬)

আল্লাহ রাজি না থাকলে কারো দোয়ায় ভাগ্য পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কোন মূর্তি নির্মাণ করে যেমন তার পূজা অর্চনা করা যাবে না, তেমনি কোন পীরের, মাজারের ও দরগারও পূজা করা যাবে না। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যারা পূজা অর্চনা করে, মূর্তির কাছে যারা নিজেদেরকে নিবেদন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لاَيَسْمَعُوْا دُعَاءَ كُمْ-وَلَوْسَمِعُوْا مَااسْتَجَابُوْا لَكُمْ-

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই কাছে দোয়া করো, তাদের কেউ-ই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। এরপরও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো, তাদের কাছেই দোয়া করো, তবুও তারা তোমাদের ডাকও শুনতে পারে না, শুনতে পারে না তোমাদের দোয়া। (সূরা ফাতির)

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, কিছু সংখ্যক মানুষ পূজা-উপাসনার ব্যাপারে তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তারা–যারা নিষ্প্রাণ মূর্তির বা জড়পদার্থের

পূজা করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেসব বুযর্গ, যারা মাজারে শায়িত রয়েছেন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ঐ সব ব্যক্তি, পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্ বিরোধী মতাবাদ-মতাদর্শ সৃষ্টি করেছে, নেতা হিসাবে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এসব চিন্তানায়কগণ বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জীবিত থাকা অবস্থায় কখনো আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করেনি এবং তাদের অনুসারীদেরকেও অনুসরণ করতে বলেনি। আল্লাহ্ বিরোধী চিন্তা-চেতনা অনুসারে তারা পরিচালিত হয়েছে এবং কর্মীদেরকেও পরিচালিত করেছে। এদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসারীগণ এদের মূর্তি নির্মাণ করে বা বিশালাকারের ছবি বানিয়ে উপাস্যের আসনে বসিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করে থাকে। এসব ছবিতে বা এদের নামে নির্মিত স্তম্ভে ফুল দেয় এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে থাকে।

এসব আল্লাহ্ বিরোধী প্রয়াত নেতাদের নামে নির্মিত স্তম্ভে, ছবিতে ফুল দিয়ে পূজা করার ব্যাপারে বা কিছুক্ষণ নীরবতা পালনের মাধ্যমে যে পূজা-উপাসনা করা হলো, এদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো, এসবের মাধ্যমে তাদের আত্মার তো উপকার হলোই না, এমনকি তারা জানতেও পারে না-তাদেরকে এভাবে তার অনুসারীরা পূজা করছে। এদের ব্যাপারে যে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে সেখানে তাদের সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করা হলো, এসব সংবাদও তারা জানতে পারে না। কারণ এরা নিজেদের মারাত্মক অপরাধের কারণে আল্লাহ্র বন্দীশালায় বন্দী রয়েছে। বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে এসব জালিম আত্মাগণ। সেখানে পৃথিবীর কোন আবেদন-নিবেদন পৌঁছে না। আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণও তাদেরকে এ সংবাদ দেন না যে, তোমরা পৃথিবীতে যে ভ্রান্ত চিন্তা চেতনার প্রবর্তন করে এসেছো, তা খুবই সফলতা লাভ করেছে এবং তোমার অনুসারীরা ফুল দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করে, সেমিনারের আয়োজন করে তোমার প্রতি সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করছে।'

এ সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছলে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভ্রান্ত চিন্তাধারার প্রবর্তক, আল্লাহ্ বিরোধী নেতাদের কলুষিত আত্মার খুশীর কারণ হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন জালিমের কখনো খুশী চান না। এখানে আরেকটি বিষয় বুঝতে হবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাতকারী বান্দাদের আত্মার কাছে পৃথিবীর মানুষের প্রেরিত সালাম এবং তাদের রহমত কামনার দোয়া পৌঁছে দেন।

কারণ এসব দোয়া-সালাম তাদের খুশীর কারণ হয়। একই ভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা অপরাধী-জালিমদের আত্মাদেরকে পৃথিবীর মানুষের অভিশাপ, ক্রোধ ও তিরস্কার সম্পর্কেও অবহিত করেন। যেন তাদের মনোকষ্ট আরো বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং কারো ছবির প্রতি, মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, মৃত ব্যক্তিদের সম্মানে কোন স্তম্ভ নির্মাণ করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আশা-আকাংখা পূরণের আশায় কারো প্রতি পূজার অনুরূপ মর্যাদা দেয়াও তাদের ইবাদাত করার শামিল। নামাজের মধ্যে 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কামনা করি' এ কথা বলার পরে কোন মুসলমানের এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কারো ছবির পূজা করবে, কোন পীরের পূজা করবে, কোন মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেবে। এসব থেকে মুসলমান নিজেকে হেফাজত করবে এবং কেবলমাত্র তার পূজা-উপাসনা, দাসত্ব-বন্দেগী আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে।

আল্লাহর দাসত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা

মানুষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে। শয়তান যেমন ঘৃণিত এবং পৃথিবীর মানুষের অভিশাপই সে প্রতি মুহূর্তে লাভ করছে, তেমিন শয়তানের পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করে, তারাও তেমনি ঘৃণিত এবং অভিশাপ লাভের যোগ্য এবং তারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তা এবং আল্লাহর মুমিন বান্দাদের ও সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ লাভ করছে। বিষয়টি বড় আশ্চর্যের যে, সাধারণ মানুষ শয়তানকে গালি দেয় আর শয়তানের অনুসরণ যারা করে, তাদের প্রতি নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করে। হাদীস শরীফে এসেছে, কোন ফাসিকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে।

সুতরাং, শয়তান এবং শয়তানের কোন অনুসারীর আনুগত্য যেমন করা যাবে না, তেমনি তাদের প্রশংসাও করা যাবে না। সম্মান, মর্যাদা ও প্রশংসা তো কেবল তারাই লাভ করতে পারেন, এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবন পারিচালিত করে থাকেন তথা আল্লাহর ইবাদাত-দাসত্ব করেন। কোন মুনাফিকও সম্মান-মর্যাদা লাভ করতে পারে না। মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে আল্লাহর আবেদ বান্দাদের অনুরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে সাধারণ মানুষকে ধোকা দিতে থাকে।

নিজের নামের পূর্বে এমন সব বিশেষণ ব্যবহার করে যে, বিশেষণের আধিক্যের কারণে ব্যক্তির আসল নাম যে কি, তা খুঁজে পাওয়া যায় না। হাদিয়ে জামান,

কাইয়ূমে জামান, মুজাদ্দেদে জামান, রাহনুমায়ে শরিয়ত, সেরাজুস সালেকিন, মেছবাহুল আরেফিন, আশেকে রাসূল, মাহবুবে খোদা, আশেকে পান্দান, সিহায়ে দান্দান, আশেকে মাওলা–এরা শুধু নামের শেষে নবীদের নামের অনুরূপ 'আলাইহিস্ সালাম' লেখাই বাদ দিয়েছে, এ ছাড়া যতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা তারা করে থাকে। এদের ভেতরে আল্লাহ্ ভীতি যে নেই, তা এদের শান-শওকত পূর্ণ জীবনধারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরা ভেক্ ধরে মানুষকে ধোকা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন হতে চায় এবং অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। এদের এই মুনাফেকী সম্পর্কে কবি বলেন–

ইয়ে হাল তেরা জাল হ্যায়, মাক্ছুদ তেরা মাল হ্যায়,

কেয়া আযব তেরা চাল হ্যায়, লাখো কো আন্ধা ক্যর দিয়া

তোমার এই বেশভূষা সম্পূর্ণ নকল, তোমার কর্মকান্ড চাতুরী পূর্ণ। তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো অর্থ-সম্পদ অর্জন করা, এভাবে তুমি অসংখ্য মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছো।

এসব মুনাফিকরা নিজেদের চিন্তার জগতে, মন-মানসিকতায় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা তথা হৃদয় জগতকে আল্লাহর রঙে রাঙাতে পারেনি। দেহটাকেই শুধু পোষাকের মোড়কে আল্লাহর রঙে রঙিন হিসাবে প্রদর্শন করার চেষ্টা করে থাকে। নিজেদের কদর্য রূপটাকে সুন্নতী লেবাসের মোড়কে আবৃত করে রেখে সাধারণ মানুষকে ধোকা দেয়ায় ব্যস্ত এসব বেদাআত পন্থীরা। এই শ্রেণীর ভন্ডদের সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন–'মন না রাঙায়ে কেন বসন রাঙালে যোগী ?'

সুতরাং সম্মান-মর্যাদার অধিকারী কেবল তারাই, যারা আল্লাহর গোলামী করেন। আর যারা একমাত্র আল্লাহর গোলাম, তারা অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে থাকেন। হকপন্থী পীর সাহেবগণ অবশ্যই হক কথা বলেন, আল্লাহ বিরোধী কোন কিছু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে থাকেন, মানুষকে নিজের গোলাম না বানিয়ে আল্লাহর গোলাম বানানোর চেষ্টা-সাধনা করে থাকেন। তারা রাজা-বাদশাহের মতো চলাফেরা করেন না। এরা সত্যকার অর্থেই আল্লাহভীরু। অর্থ-সম্পদের প্রতি এরা দৃষ্টি দেন না, দৃষ্টি দেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে আর এই ইবাদাতই মানুষের

ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে দিবে। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশী ভয় করে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর দাসত্ব করার লক্ষ্যে। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো দাসত্ব করা। দাসত্বের মাধ্যমে যারা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত বান্দাহ্ হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর ইবাদাত গুজার কোন বান্দাহ্ সম্পর্কে অনুগ্রহ করে, কিছু বলেছেন–তখন পরম স্নেহের ভাষা, আদরের ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্নেহের সেই ভাষাটি হলো, 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দাহ্। যারা আল্লাহর দাসত্ব করবে তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ মমতার ভাষায় বলেছেন–

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا–

জান্নাতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য প্রবাহিত ঝর্ণধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার কাছে গিয়ে তাদেরকে পানি পান করতে হবে না, বরং তাদের ইশারায় ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে।

জান্নাতে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা রয়েছে, এসব ঝর্ণার পানি হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করেছে, তারা জান্নাত লাভ করবে এবং সেই ঝর্ণার পানি পান করবে। পানি পান করার জন্য তাদেরকে ঝর্ণার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, তারা শুধু ইশারা করবে আর অমনি ঝর্ণা তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইবাদুল্লাহ্ বলে, তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কথা উল্লেখ করেছেন। যারা আল্লাহর দাসত্ব করে, তারা তাঁর কাছে কতটা সম্মান ও মর্যাদা ল্যাভ করবেন, তা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলামী করে, তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা পরম মমতাভরে সূরা ফুরকানের ৬৩ নং আয়াতে বলেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا–

রাহ্মানের বান্দাহ্ যারা তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে যমীনে চলাফেরা করে।

যারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে, আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতে তাদেরকে অত্যন্ত আদর করে 'রাহ্‌মানের বান্দাহ্‌' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত এভাবেই মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করে দেয়। ইবলিস শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করার পরে যখন সে অভিশপ্ত হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহ্‌র সামনে বলেছিল–হে আল্লাহ ! তোমার যে বান্দার কারণে আমি অভিশপ্ত হলাম, আমি সেই বান্দাদেরকে প্রতারণা, প্ররোচনা, লোভ-লালসা, প্রলোভন ইত্যাদির মাধ্যমে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করবো। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা ইবলিসকে বলেছিলেন–

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দাহ যারা তাদের ওপর তোর কোন আধিপত্য চলবে না। তোর কর্তৃত্ব তো শুধু সেই বিভ্রান্ত লোকদের ওপরেই চলবে, যারা তোর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। (সূরা হিজর-৪২)

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা পরম স্নেহের সাথে 'আমার বান্দাহ্‌' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহর দাসত্বকারী বান্দাহ্‌দেরকে এভাবে পবিত্র কোরআনে 'আব্‌দ' বা বান্দাহ্ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দ দিয়ে তাদের প্রতি সম্মান-মর্যাদা ও আল্লাহর রহমত-করুণার কথাই বলা হয়েছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে একটি মারাত্মক ধারণা পোষণ করে। তারা বলে–

وَقَالَتِ النَّصرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّهِ–

খৃষ্টানারা বলে মসীহ হলেন আল্লাহর পুত্র। (সূরা তওবা-৩০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এই মারাত্মক ধারণার প্রতিবাদ করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মমতার সাথে জানিয়ে দিলেন–

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ عَنْ عَمْنَا عَلَيْهِ –

সে আমার একজন বান্দাহ্ ব্যতীত আর কিছুই নয়। (কোরআন)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া লজ্জার কোন বিষয় তো নয়-ই বরং গৌরবের। মানুষ আল্লাহর বান্দাহ্, এটা মানুষের অহঙ্কার। কোন নবী এবং ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ করেননি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا اللّهِ وَ لاَ
الْمَلئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ

মসীহ আল্লাহর বান্দাহ্ এবং এ বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে তিনি কখনো লজ্জা অনুভব করেননি, এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশ্তাগণও আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করেন না। (সূরা নেছা-১৭২)

আর যারা আল্লাহর গোলাম হওয়ার ব্যাপারে লজ্জানুভব করে এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করে, তাঁর গোলামী করতে অস্বীকার করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন–

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ
اِلَيْهِ جَمِيْعًا–

আল্লাহর দাসত্ব করার ব্যাপারে যারা লজ্জা পোষণ করবে, অহঙ্কার প্রদর্শন করবে–তাহলে তারা সেদিন আত্মরক্ষা করবে কিভাবে, যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে ? (সূরা নেছা-১৭২)

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার

আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর বান্দাহ্ হওয়া মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং পৃথিবী ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। এটা মানুষের জন্য সব থেকে বড়, নে'মাত যে, সে আল্লাহর বান্দাহ হতে পেরেছে। কারণ পৃথিবীতে সমস্ত নবী-রাসূলই আগমন করেছিলেন, মানুষকে আল্লাহর বান্দাহ্ হিসাবে গড়ার জন্য। এই সম্মান ও মর্যাদা বড়ই দুর্লভ। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে এই দুর্লভ গুণে মানুষকে গুণান্বিত হতে হবে। যারা এই গুণে গুণান্বিত হতে পারবে, তারই কেবল সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে কাছের-জন হলেন নবী-রাসূলগণ। তাঁর পরম প্রিয় নবী-রাসূলদেরকেও তিনি পরম স্নেহভরে 'বান্দাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ইউসুফে বলেছেন–

كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ–اِنَّه مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلَصِيْنَ–

এরূপই ঘটলো, যাতে আমি অন্যায় পাপ ও নিলর্জতা তার থেকে বিদূরিত করে দিই। প্রকৃত পক্ষে সে আমার নির্বাচিত বান্দাহ্দের একজন ছিল।

এ আয়াতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ আদর করে তাঁর 'বান্দাহ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে বিশেষ এলাকার জন্য, বিশেষ জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা পৃথিবীর নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর দরবারে যে কতটা উচ্চে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর থেকে প্রিয় পাত্র আল্লাহর কাছে আর কেউ নেই। তাঁকেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বান্দাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا-

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়।

সমস্ত নবী-রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা নাম ধরে সম্বোধন করলেও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো নাম ধরে অর্থাৎ 'হে মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করেননি। তাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে মর্যাদার কারণে তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে নানা ধরনের গুণবাচক নামে আহ্বান জানিয়েছেন। পরম মমতাভরে 'বান্দাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কোরআনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى অতঃপর তাঁর বান্দার কাছে যা ওহী করার ছিল, তা তিনি পূর্ণ করলেন। (কোরআন)

অন্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে এভাবে বলেছেন–

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا-

আল্লাহর এই বান্দাহ্ যখন নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে দণ্ডায়মান হলো, তখন তারা তাঁর ওপরে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। (কোরআন)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরেক আয়াতে বলেছেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا-

অতীব বরকতপূর্ণ সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার ওপরে ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন।

মে'রাজের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রাসূল প্রসঙ্গে বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَا-

পাক-পবিত্রতম সেই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহ্কে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল)

এ ধরনের অনেক আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবিবকে আব্দ বলে সম্বোধন করেছেন। এই শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া সবচেয়ে বড় খেতাব। এই খেতাব যারা অর্জন করতে পারবে, তারাই কেবল জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে, অন্য কেউ নয়। এই খেতাব অর্জন করতে হলে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, গোলামী, আনুগত্য, বন্দেগী ও পূজা, উপাসনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন শির্ক এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না।

দাসত্বকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা

যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের লক্ষ্য করে ওয়াদা করেছেন। কর্মের মাধ্যমে যারা আল্লাহর 'বান্দাহ্' হওয়ার উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন। সে পুরস্কার এই পৃথিবীতেও যেমন দেয়া হবে, তেমিন দেয়া হবে আখিরাতে। এটা আল্লাহর ওয়াদা-আর আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তাঁর ওয়াদাই হলো সবেচেয়ে দৃঢ় ওয়াদা। তিনি যে অঙ্গীকার করেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী বান্দাদের জন্য আল্লাহ এই পৃথিবীতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا-يَعْبُدُوْنَنِى لاَيُشْرِكُوْنَ بِى شَيْئًا-

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তাদেরকে তিনি পৃথিবীতে ঠিক তেমনিভাবে খিলাফত দান করবেন যেমন

তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে দান করেছিলেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যাকে আল্লাহ্ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের বর্তমান ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে।

আল্লাহর তা'য়ালার পরিষ্কার ওয়াদা, যারা আল্লাহর গোলামী করবে আল্লাহ্ তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদেরকে দান করবেন। সেই সাথে যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি দান করবেন। মানুষ যে ভীতিকর অবস্থায় বর্তমানে এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, সন্ত্রাস নামক দানব যেভাবে গোটা মানবতাকে গ্রাস করেছে, এ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করবে। এই বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষমতা ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করার শর্ত হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এবং এই দাসত্বের ক্ষেত্রে কোন ধরনের শির্ক করা যাবে না অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পাশাপাশি কোন মানুষের বানানো বিধানেরও অনুসরণ করা যাবে না। খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে।

যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্ব করবে, তারাই হবে এই পৃথিবীর শাসক। এরা শাসিত হবে না, গোটা বিশ্বকে এরা শাসন করবে। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা শাসিত (Dominated) হবে না–বরং তোমরাই শাসন (Dominate) করবে। ভীতির পরিবর্তে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করার যে ওয়াদা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসাবে লেখা হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা প্রকৃত ঈমানদার, চরিত্র ও কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দীয় আদর্শের আনুগত্যকারী এবং সবধরনের শিরক মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বকারী। যাদের ভেতরে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য নেই, নিছক মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা আল্লাহর এই ওয়াদা লাভের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ ওয়াদা দেয়াও হয়নি। সুতরাং নামাজ-রোজার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে আর জীবনের অন্য সমস্ত বিভাগে মানুষের বানানো আইন-বিধান অনুসরণকারী তথাকথিত মুসলমানদের এই আশা নেই যে, তারা আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করবে।

আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী, ইবাদাত, পূজা-উপাসনাকারীদের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা যে পুরস্কার দান করবেন তাহলো, তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব

দান করবেন, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন, যাবতীয় সন্ত্রাস বিদূরিত করবেন এবং শান্তি ও স্বস্তি দান করবেন। এটা হলো পৃথিবীতে দেয়া পুরস্কার। তারপর তাদের ইন্তেকালের পরে আখিরাতের ময়দানে যে পুরস্কার দেয়া হবে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْه فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ–

যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম। (কোরআন)

অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুসরণ করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে, তারা সফল হয়েছে। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পৃথিবীতে যে দায়িত্ব তাদের ছিল, তারা সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে এবং দায়িত্ব পালন করেছে। এভাবে তারা সফলকাম হয়েছে অর্থাৎ জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا–وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا–وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا–

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমি এমন বাগিচায় স্থান দান করবো যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা নিসা-১২২)

ইসলামে ইবাদাতের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইবাদাত যথাযথভাবে করার ওপরেই মানব জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে। এ জন্য এই ইবাদাতের বিষয়টি পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা, যে সূরাটি মুসলমানদেরকে নামাজের মধ্যে বারবার পাঠ করতে হয়, সে সূরায় তা উল্লেখ করেছেন। ইবাদাত করলে আল্লাহ কি পুরস্কার দান করবেন, কোরআনে তাও উল্লেখ করেছেন, মুসলমানদেরকে এই ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর

নেতৃত্ব তাদেরকে করায়ত্ব করতে হবে এবং পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসের অপশক্তিকে বিদায় করতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তি পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে গোটা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাসের দানবকে অর্গল মুক্ত করে দিয়েছে। সন্ত্রাসের চিরাচরিত সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। নিজেদের সন্ত্রাসী তান্ডবকে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে অবিহিত করছে আর মুসলমানদের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে সন্ত্রাস নামে চিহ্নিত করছে। শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে তারা মুসলিম দেশসমূহে মানবতা বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নারী, শিশু, কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে।

এই অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করার জন্যই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর গোলামী করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে গোলামী করলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবেন, তখন আল্লাহ তাঁর গোলামদের মাধ্যমেই এই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস বিদূরিত করে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা

এই ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। ইবাদাতের এই ভুল অর্থ, ভুল ব্যাখ্যা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতরে ছড়িয়ে আছে। সাধারণ মুসলমানগণও যেমন ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে, তেমনি অসাধারণ মনে করা হয় যাদেরকে, তারাও এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানই এই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে বলে, তারা ইবাদাতের প্রকৃত হক আদায় করছে না।

সাধারণ মুসলমানগণ ইবাদাতের যে ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে তাহলো–তারা মনে করেছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ আদায় করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, যিকির করা, তস্‌বীহ্ জপা ইত্যাদি হলো ইবাদাত। এসব পালন করার অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, তখন তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। এই স্বাধীন জীবনে তারা আল্লাহর বিধানের প্রতিটি ধারাকে নিষ্ঠুরভাবে লংঘন করে। যারা রোজা পালন করে তারা বছরে একটি মাস রোজা পালন করে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে তারা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মনে করে, ইবাদাতের যাবতীয় হক আদায় হয়ে গেল।

এটাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয় ? খুব বেশী হলে দেড় ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এই নামাজ আদায়ের নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, একজন মানুষ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলাম। অবশিষ্ট সাড়ে ২২ ঘন্টার জন্য সে শয়তানের গোলাম।

এভাবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দেড় ঘন্টার জন্য আল্লাহর গোলামী যে করলো তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিমাসে মাত্র ৪৫ ঘন্টা আল্লাহর গোলামী করলো। এক বছরে সে ৫৪০ ঘন্টা গোলামী করলো আল্লাহর। মানুষ যদি গড় আয়ূ লাভ করে ৬০ বছর, তাহলে সে গোটা জীবনকালে ৩২৪০০ ঘন্টা গোলামী করলো। ২৪ ঘন্টায় একদিন অনুসারে মানুষ ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ১৩৫০ দিন অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের সামান্য কিছু বেশী সময় আল্লাহর গোলামী করলো আর বাকি সাড়ে ৫৬ বছর শয়তানের গোলামী করলো।

একমাস রোজা পালন করার নামই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে বছরের অবশিষ্ট ১১ মাসের জন্য সে শয়তানের গোলাম। ৬০ বছরের জীবনকালে নিয়মিতভাবে প্রতি রমজান মাসে রোজা আদায় যদি করা হয়, তাহলে প্রতি বছরে ১ মাস হিসাবে মাত্র ৬০ মাস অর্থাৎ ৫ বছর হয়। মানুষ তার ৬০ বছরের জীবনকালে মাত্র ৫ বছরের জন্য আল্লাহর গোলাম হবে আর অবশিষ্ট ৫৫ বছর শয়তানের গোলামী করবে?

কোন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি শয়তানের গোলাম বা চাকর হতে প্রস্তুত রয়েছেন কি না ? এই প্রশ্নের উত্তরে একজন মুসলমানও স্বীকৃতি দিবে না যে, সে শয়তানের গোলামী করবে। সুতরাং ইবাদাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত আদায় করার নামই ইবাদাত নয়। এগুলো অবশ্য করণীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, এগুলো তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত হলো ইবাদাতের একটি অংশ। ইবাদাতের যে বিশাল পরিধি রয়েছে, তার কিছু মাত্র অংশ হলো নামাজ-রোজা। এগুলো একমাত্র ইবাদাত নয়। এই নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত মানুষকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইবাদাতের যোগ্য করে গড়ে তোলে। এগুলো যারা আদায় করে না, তারা ইবাদাতের যোগ্য কোনক্রমেই হতে পারে না। সৈনিক জীবনে যেমন কুচকাওয়াজ করাই একমাত্র কাজ নয়, যুদ্ধের যোগ্য সৈনিক হিসাবে গড়ার লক্ষ্যেই তাদেরকে নানা ধরনের

ট্রেনিং দেয়া হয়, কুচকাওয়াজ করানো হয়। তেমনি নামাজ-রোজা নিষ্ঠার সাথে আদায় করার নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের বৃহত্তর ইবাদাতের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে যোগ্যতার সাথে যেন পালন করতে সক্ষম হয়, সেই যোগ্যতা যেন মুসলমান অর্জন করতে পারে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমান যেন আল্লাহর বিধান অনুসরণের অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্যই নামাজ-রোজা আদায় করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কতটা ভুল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তা বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিমদের করুণ অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করলে তাদেরকেই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করা হবে। পৃথিবীকে শাসন করবে তারা। এটা আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা। অথচ আমরা দেখছি, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদাত করছে অর্থাৎ তারা নামাজ আদায় করছে, রোজা পালন করছে কিন্তু পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করা তো দূরের বিষয়–গোটা পৃথিবীব্যাপী তারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে একটি কুকুর-বিড়ালের যে মূল্য রয়েছে, সে মূল্য মুসলমানদের নেই। তাহলে আল্লাহর ওয়াদা কি অসত্য? মুসলমান আল্লাহর ইবাদাত করছে–তাদের এই দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অসত্য বলে বিবেচনা করতে হয়। আল্লাহর ওয়াদা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহলে মুসলমানদের দাবী মিথ্যা বলে বিবেচনা করতে হয়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। তাঁর চেয়ে ওয়াদা রক্ষাকারী কোন সত্তার অস্তিত্ব কোথাও নেই। মুসলমানদের এই দাবীই মিথ্যা যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে। মুসলমানরা এই ইবাদাতের খন্ডিত অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠাহীনভাবে পালন করে থাকে। তারা নামাজ-রোজা আদায় করে অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন দল করে, যে দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বিপরীত।

ঘুষ গ্রহণ করে, ঘুষ দেয়, মদপান করে, জিনা-ব্যভিচার করে, অশ্লীলতা আর নগ্নতা প্রসার-প্রচার করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, প্রতিবেশীর হক আদায় করে না, মাতা-পিতার অধিকার ক্ষুন্ন করে, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে, মিথ্যা মামলা করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়। নারী ধর্ষন করে, নরহত্যা করে। মাজারে গিয়ে ধর্ণা দেয়, জীবিত ও মৃত মানুষকে শক্তিধর-নিজের প্রয়োজন পূরণকারী মনে করে। এক

টুকরা রুটি, এক পাত্র পানির আশায় আল্লাহর দুশমনদের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কোন অপরাধ নেই যে, মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে না। অথচ তারা দাবী করছে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে থাকে।

হজ্জ আদায় করে মক্কা-মদীনায় দাঁড়িয়ে মুসলমান বলে দাবীদারগণ ওয়াদা করছে, দেশে প্রত্যাবর্তন করেই সেই ওয়াদা ভঙ্গ করছে। ব্যাংকে গিয়ে সুদের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। সরকারের ট্যাক্স কমানোর জন্য ঘুষ দিয়ে ট্যাক্স কমিয়ে সরকারকে ধোকা দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করছে। নির্বাচনের সময় পেশীশক্তি ব্যবহার করে জনগণের ভোট ছিন্তাই করছে। স্ত্রী-কন্যাদেরকে চলচিত্র জগতে পাঠিয়ে, মডেলিংয়ের নামে তাদের রূপ-যৌবন প্রদর্শনী করে দেহপসারিণী-রূপজীবিনীর ভূমিকা পালন করিয়ে অর্থ উপার্জন করছে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, গ্যাস বিল, পানির বিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির অর্থআত্মসাৎ করে সে অর্থের সামান্য অংশ মসজিদে-মাদ্রাসায় দান করে, মাজারে-মৃত মানুষের কবর আবৃত করার জন্য মূল্যবান চাদর কিনে দিয়ে ধারণা করেছে, ইবাদাতের হক আদায় করা হলো।

এটাই যদি মুসলমানদের ইবাদাতের প্রকৃত স্বরূপ হয়, তাহলে পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত-লাঞ্ছিত কেন হচ্ছে ? সত্যকারের ইবাদাত যদি মুসলমানদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব ঈমানদের হাতে নেই কেন ? মুসলমান যদি সত্যই ইবাদাত বুঝে করতো, তাহলে মানবতা আজ এতটা নিম্ন স্তরে নেমে যেতো না। বিশ্বজুড়ে অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তো না। সন্ত্রাস দমনের নামে অমুসলিম শক্তি মুসলিম দেশসমূহে আগ্রাসন চালাতো না, নির্বিচারে গনহত্যা করতো সক্ষম হতো না।

সাধারাণ মুসলমান এভাবে শুধু-নামাজ-রোজা, যাকাত দেয়া আর হজ্জ আদায়কে ইবাদাত মনে করেছে, রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, শিল্প-সংস্কৃতি, যুদ্ধ,সমরনীতি ইত্যাদিকে ইবাদাত মনে করেনি। ব্যবসা, কৃষিকাজ চাকরীকে ইবাদাত মনে করেনি। মুসলমান চাকরী করে, অথচ সে চাকরীকে সে ইবাদাত মনে করে না বলেই চাকরীতে ফাঁকি দেয়। সুস্থ মানুষ অথচ সে মেডিকেল লিভ নিয়ে নিজেকে অসুস্থ দেখিয়ে ছুটি গ্রহণ করে তাবলিগে চিল্লা দিতে, ইজ্তেমায়, ইসালে সওয়াবে, ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেয় সওয়াবের আশায়। এটা স্পষ্ট ধোকাবাজি।

চাকরী জীবনে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা যথারীতি পালন করা অবশ্যকরণীয় তথা ইবাদাত। যারা চাকরী করে তাদের মধ্যে যারা নামাজ আদায় করে, নামাজের সময় হলে ফরজ নামাজ, সুন্নাত নামাজ আদায় করে পুনরায় নিজের কর্মে যোগ দিতে হবে। টাইম কিলিং করার জন্য, সময় ক্ষেপণ করার জন্য নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। এর নাম ইবাদাত নয়–চাকরী ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ফরজ, সুতরাং ফরজ ত্যাগ করে নফল আদায় করা যাবে না। একশ্রেণীর মানুষ এ ধরনের কাজ ইবাদাত মনে করেই করে। কিন্তু এসব ইবাদাত নয়। ইবাদাত হলো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামী করা।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ভুল করেছে আর এদের পক্ষে ভুল করাই বর্তমান পরিবেশে স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একশ্রেণীর অসাধারণ মানুষও ইবাদাত সম্পর্কে ভুল করেছে। এরা মসজিদের চার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, খান্‌কায় বসে তস্‌বীহ জপ করা, হুজরাখানায় বসে নফলের পর নফল নামাজ আদায় করাকেই ইবাদাত মনে করেছেন। গোটা জাতি যখন জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত, ঘৃণ্য সুদ নামক দানব যখন জাতিকে গ্রাস করছে, অশালীন অশ্লীল গান-বাজনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রাস জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে, আল্লাহর আইন-বিধানের পরিবর্তে যখন মানুষের বানানো আইন চলছে, শয়তানি শক্তির সৃষ্ট ঝড় দাপটের সাথে এসে মসজিদের দরজায়, হুজরাখানা-খানকার দরজায় আঘাত করছে, তখনও এসব অসাধারণ মুসলমানগণ চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌ নামের যিকির করছেন, বিশালাকারের তস্‌বীহর দানা ঘুরিয়ে চলেছেন। এর নাম কি পরহেজগারীতা, আল্লাহভীতি বা ইবাদাত করা?

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যখন সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করছে, দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করছে, মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে, মুসলিম মা-বোনদেরকে ধর্ষন করা হচ্ছে, মুসলিম শিশুদেরকে পা ধরে তার মাথা পাথরের ওপরে দেয়ালের সাথে আছাড় দিয়ে হত্যা করছে, প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে, বোমার আঘাতে মুসলিম দেশ, মসজিদ ধূলার সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত মুসলমানকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে যে মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ শ্রেণীর অসাধারণ মুসলমানগণ হুজরাখানা, খানকা আর মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ

থেকে তসবীহ জপ করতে থাকে, যিকির করতে থাকে, নফল নামাজ আদায় করতে থাকে। এটাকেই কি ইবাদাত বলা হয়? মুসলিম দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে যদি এগিয়ে যাওয়া না হয়, আন্তর্জাতিক দস্যুদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না করা হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কণ্ঠ সোচ্চার না হয়, তাহলে যে ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে, সেই ইবাদাত কোন কাজে আসবে না এবং এ ধরনের ইবাদাতকারীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।

যিকির করতে হবে, তসবীহ তিলাওয়াত করতে হবে, কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে, নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে হবে, নফল রোজাও রাখতে হবে, সেই সাথে অন্যায়, অবিচার, অনাচার তথা আল্লাহ বিরোধী আইন-কানুন বিধান তথা যাবতীয় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ময়দানে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এতে যদি দেহের তপ্ত রক্ত ময়দানে ঢেলে দিতে হয়, তাই দিতে হবে।

অর্থ-সম্পদ অকাতরে দু'হাতে বিলিয়ে দিতে হয় তাই দিতে হবে। যদি কারাগারের অন্ধ কুঠরীতে প্রবেশ করতে হয়, হাসি মুখে প্রবেশ করতে হবে। প্রয়োজনে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। ইবাদাতের এই হক আদায় করার জন্য যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতির মোকাবেলা হাসি মুখে করতে হবে। তাহলেই ইবাদাতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে এবং আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়া যাবে।

হযারত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্তী আজমেরী (রাহ্), হযরত শাহ্জালাল ইয়ামেনী (রাহ), হযরত খানজাহান আলী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত শাহ্ মাখদুম রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুর্জাদ্দেদে আল-ফেছানী (রাহ), শহীদ সাইয়েদ আহ্মদ (রাহ), শহীদ ইসমাঈল হোসেন (রাহ্), শহীদ মাহ্মুদ মোস্তফা আল-মাদীন (রাহ)সহ এ ধরনের অগণিত অসাধারণ মুসলমান তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেছেন, তসবীহ তেলাওয়াত, কোরআন তিলাওয়াত, যিকির, নফল নামাজ আদায় করেছেন। সেই সাথে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে কোরআন ধারণ করেছেন। ময়দানে তারা বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। নিজেকে রাসূলের আওলাদ বলে দাবী করে, নামের পূর্বে অসংখ্য বিশেষণ জুড়ে দিয়ে ইবাদাতের হক আদায় করা যাবে না. আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাগণ যেভাবে ইবাদাতের হক আদায় করেছেন, সেভাবে আল্লাহর দাসত্ব, বন্দেগী তথা

ইবাদাত করতে হবে। সাধারণ এবং অসাধারণ মুসলমানগণ কথা ও কাজে সাম স্য রেখে নামাজ-রোজা, হজ্জ, যাকাত, তসবীহ, কোরআন তিলাওয়াত করবেন যে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বা তাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে, সেই আল্লাহরই নির্দেশ অনুসারে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যায়-অনাচার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ময়দানে প্রতিবাদী পদক্ষেপে বিচরণ করতে হবে।

সুতরাং ইবাদাত বলতে কি বুঝায়, পবিত্র কোরআন কোন ধরনের কর্মকান্ডকে ইবাদাত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কোন ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিল, এসব দিক বুঝতে হবে। ইবাদাত সম্পর্কে যদি ধারণা অর্জন করা না যায়, তাহলে মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় দেয়াই বৃথা। কারণ মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিই করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য, আল্লাহর গোলামী করার জন্য।

আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা

আল্লাহর ইবাদাত বা গোলামী কি ধরনের হতে হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ দৃষ্টান্ত হিসাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। কেননা তিনিই আমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান এবং স্বয়ং আল্লাহ তাকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারায় তাঁর সম্পর্কে বলেন–

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ–قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তার অবস্থা এই ছিল যে, তার রব যখন তাকে বললেন, অবনত ও অনুগত হও। তখনি সে বললো, আমি অনুগত হলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে।

আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তব নমুনা তিনি প্রদর্শন করলেন। আল্লাহ যখনই তাকে অনুগত হওয়ার আদেশ দিলেন, তিনি ওমনি কোন ধরনের শর্ত ব্যতীতই তার মাথাকে নত করে দিলেন। তিনি যেভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে অবনত করে দিয়েছিলেন, তিনি ইবাদাতের ব্যাপারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সেই একই পন্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি আদেশ দিয়েছিলেন–

وَ وَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ-يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

এ পথে চলার জন্য সে তার সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই একই উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। সে বলেছিল, হে আমার সন্তানগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই জীবন ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে। (সূরা বাকারা-১৩২)

হযরত ইবারাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর গোলামী করা ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করবে না। শুধুমাত্র আল্লাহর-ই দাসত্ব করবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামও তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবন ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, সে বিধান অনুসারেই জীবন পরিচালিত করবে। মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে থাকবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামের যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে যেসব কথা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে শুনাচ্ছেন–

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ-اِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ-

ইয়াকুব যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে পুত্রগণ ! আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে ? (সূরা বাকারা-১৩৩)

পৃথিবী থেকে চির বিদায়ের পূর্বে মুসলিম পিতার যা কর্তব্য, সেই কর্তব্যই তিনি পালন করেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে সমবেত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কার দাসত্ব করবে ? সন্তানগণ জবাবে বলেছিল–

قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا-وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-

তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদাত করবো, যাকে

আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক–ইলাহ্ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত হয়ে থাকবো। (সূরা বাকারা-১৩৩)

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রশ্নের জবাব সন্তানদের কাছ থেকে এভাবে পেলেন যে, আমরা ইবাদাত করবো আপনার রব-এর, যাকে আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস্ সালাম রব হিসাবে, ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করেছিল। দাসত্বের বা গোলামীর পূর্ণাঙ্গ নমুনা হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। গোটা পৃথিবী যখন শির্কের কৃষ্ণ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তিনি তখন তাওহীদের উজ্জ্বল শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আল্লাহর ইবাদাত করার ব্যাপারে যারা একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত, নিবেদিত প্রাণ–তাদের নেতা হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মনোনীত করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ-قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا-

স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার রব্ব বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন এবং সে ঐসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের নেতা করতে চাই। (সূরা বাকারা-১২৪)

তার প্রথম পরীক্ষা ছিল অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ হওয়া। দ্বিতীয় পরীক্ষা ছিল, আল্লাহর আদেশে নির্জন মরুপ্রান্তরে নবজাতক সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে আসা। তৃতীয় পরীক্ষা ছিল, নিজের সন্তানকে আল্লাহর আদেশে কোরবানী দেয়া। স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, এসব পরীক্ষা ছিল বড় কঠিন পরীক্ষা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এসব চরম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে জানালেন–سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের প্রতি সালাম রইলো।

এভাবে আনুগত্যের তথা ইবাদাতের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত জাতির পিতা হিসাবে নির্বাচিত করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা হজ্জ-এ বলেন–

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ-هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ-

তিনিই তোমাদের জাতির পিতা এবং তিনিই তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান।

ইবাদাতের পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীবাসীর সামনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে পেশ করেছেন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইবরাহীমের মিল্লাত এবং তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করেছেন, সেটাই একমাত্র সত্য আর ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা যা বলে তা মিথ্যা। কোরআন বলছে–

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصرى تَهْتَدُوْا-قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

ইয়াহুদীরা বলে-ইয়াহুদী হও, তাহলে সত্য পথ লাভ করতে পারবে। খৃষ্টানরা বলে-খৃষ্টান হও তবেই সত্য পথের সন্ধান পাবে। (আল্লাহ বলেন) এদের সবাইকে বলে দাও যে, এর কোনটিই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (সূরা বাকারা-১৩৫)

ইয়াহুদী–খৃষ্টানদের ব্যাপারে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো, তোমাদের কোন কথা বা দাবী সত্য নয়। বরং তোমরা তোমাদের ভ্রান্তপথ ত্যাগ করে হযরত ইবরাহীমের আদর্শে দিক্ষিত হও, তার মিল্লাতের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, তাকে অনুসরণ করো–আর এটাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ তথা আল্লাহর আনুগত্যের পথ। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন–

اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا-

সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে মিল্লাতে ইবারহীমের মধ্যে শামিল হয়ে যাও–তারই অনুসরণ করো।' মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবাদাতের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হবার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন–اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَيْرُالْبَرِيَّا ইবরাহীম হচ্ছেন পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তি।

এ জন্য আনুগত্য, বন্দেগী, দাসত্ব, গোলামী বা ইবাদাতের মানদন্ড হিসাবে আমাদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিভাবে তিনি কোন ধরনের প্রশ্ন বা আপত্তি ব্যতীতই আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন। আল্লাহর

কোরআনে এসব ঘটনা গাল-গল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। এসব ঘটনা থেকে মুসলমানরা শিক্ষা গ্রহণ করবে, এ জন্য এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।

মানুষের জীবনে যতগুলো প্রয়োজন রয়েছে, তার ভেতরে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, খাদ্য এবং নিরাপত্তা। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের অন্যতম অধিকারও এ দুটো বিষয়। মানুষ পেট ভরে আহার করতে চায়, ক্ষুধা মুক্ত থাকতে চায় এবং নিরাপত্তার সাথে জীবন-যাপন করতে চায়। নির্বাচনের সময় চিহ্নিত কোন সন্ত্রাসীকে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে না। প্রার্থীদের মধ্য থেকে যার প্রতি এমন আস্থার সৃষ্টি হয় যে, এই লোকটি আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ দান করতে সক্ষম হবে, ভোটাররা তাকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। কিন্তু মানুষের ভাগ্যলিপির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, মানুষ তারই মতো আরেকজন মানুষকে খাদ্যদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী করে মনে করে চিরকালই ভুল করেছে। উল্লেখিত দুটো জিনিস মানুষ লাভ করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ এই মানুষের কাছে ওয়াদা করেছেন, তোমরা আমার ইবাদাত করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য ও নিরাপত্তা দান করবো। সূরা কুরাইশে বলা হয়েছে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ-
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ-

সুতরাং তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের রব-এর ইবাদাত করা, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে দুরে রেখে নিরাপত্তা দান করেছেন।

জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একমাত্র আমার গোলামী করো, আমার দাসত্ব করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্যদান করবো, আমিই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করবো। একনিষ্ঠভাবে আমারই আনুগত্য করো।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ওয়াদা করেছেন, যে এলাকার লোকজন একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য, দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে, তাদের কোন অভাব থাকবে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। নানা ধরনের ফসল এমনভাবে উৎপাদিত হবে যে, মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ

করার পরও তা উদ্বৃত্ত রয়ে যাবে। তিনি আকাশ ও যমীনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ–

লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ ও জমিনের বরকতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতাম। (সূরা আ'রাফ-৯৬)

আল্লাহর প্রতি মানুষের দাবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সবচেয়ে বড় দাবী কি হতে পারে, এ কথাও মানুষ জানে না। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা অনুগ্রহ করে, মেহেরবানী করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সূরা ফাতিহার মাধ্যমে মানুষকে এভাবে আল্লাহর কাছে দাবী জানাতে বলেছেন, আমাদেরকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করো। মানুষের চাওয়ার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ গোটা ত্রিশপারা কোরআন বান্দার সামনে পেশ করে দিয়ে জানালেন, তোমরা যে সহজ সরল পথের দাবী আমার কাছে পেশ করেছো, এটাই সেই সহজ সরল পথ। একমাত্র আমার দাসত্ব করবে এটাই হলো সবচেয়ে সহজ সরল পথ। সূরা ইয়াছিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ-هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

কেবলমাত্র আমারই দাসত্ব করবে আর এটাই হলো সহজ সরল পথ।

পৃথিবীতে ক্ষুধা মুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, স্বস্তি, শান্তি অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকার লাভ করতে হলে যেমন আল্লাহর ইবাদাত করা অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা প্রয়োজন, তেমনি পরকালে জান্নাত লাভ করতে হলেও আল্লাহর ইবাদাত করা অপরিহার্য। জান্নাতে কে না যেতে চায়, সবাই জান্নাতের প্রত্যাশা করে থাকে। ইবাদাতের ভুল অর্থ গ্রহণ করে যেসব মানুষ ইবাদাতের ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তারাও কিন্তু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তাঁর জান্নাত লাভের আশাতেই তা করেছে। মুসলমান বলে দাবী করে কিন্তু পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে। এ লোকগুলোও আল্লাহর জান্নাত কামনা করে। আল্লাহ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন, এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর কোরআন খানির আয়োজন করা হয়, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়, দান-খয়রাত করা হয়। লোকজন ভাড়া করে এসব

আয়োজন করার মধ্যে কি স্বার্থকতা রয়েছে, তা আয়োজকরা আদৌ জানে কি না সন্দেহ। তবুও মৃত ব্যক্তি যেন জান্নাত লাভ করতে পারে, এ আশাতেই তারা ঐসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো নির্ভেজাল পদ্ধতিতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ-وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

আমার ইবাদাতকারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (সূরা ফাজর-৩০)

আল্লাহ বলেন, বান্দাহ্–আমার জান্নাতে যেতে চাও। তাহলে আমার গোলামীর খাতায় সর্বপ্রথমে নিজের নামটি লিপিবদ্ধ করো, আমার গোলামী, বন্দেগী, দাসত্ব, ইবাদাত, পূজা-উপাসনা করো। তাহলে তোমরা আমার জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে। জান্নাতীরা আল্লাহর জান্নাতে সমস্ত নিয়ামত লাভ করবে। সেখানে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো মহান আল্লাহর দিদার লাভ। কেউ যদি জান্নাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি কেউ পেতে চায় তাহলে তাকেও একমাত্র ঐ আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا-

সুতরাং যে তার রব-এর সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং দাসত্ব করার ক্ষেত্রে নিজের রব-এর সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়। (সূরা কাহ্ফ-১১০)

যদি কেউ প্রশ্ন ওঠায়, আল্লাহর এই গোলামী করার কি কোন নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে বা জীবনের কতটুকু সময় এই গোলামী করতে হবে ? এই প্রশ্নের জবাবও মানুষকে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করতে হবে। মানব জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহরই গোলামী করতে হবে। পৃথিবীর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকবে এবং তাঁরই গোলামীর মাধ্যমেই সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে।

পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহর

সমস্ত সৃষ্টির মালিক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এসব সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও আল্লাহর। এই দায়িত্ব তিনি অন্য কারো প্রতি অর্পণ করেননি। স্বয়ং তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ জন্য মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার কাছে এমন একটি পথ তোমরা কামনা করো, যে পথ হবে সত্য, সহজ-সরল। কারণ এই পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁকা পথ রয়েছে, এসব পথ তোমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, এসব পথে চললে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ-

আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে যেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই অর্পিত হয়েছে। (সূরা নাহ্‌ল-৯)

পৃথিবীর মানুষের জন্য চিন্তা-চেতনা ও কর্মের নানা ধরনের পথ হতে পারে এবং তা থাকাও স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এই অসংখ্য পথের সবগুলোই তো আর সত্য হতে পারে না। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। যেমন যেসব শিক্ষার্থীগণ যখন অঙ্ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তখন যারা অঙ্কে ভুল করে, তাদের ফলাফল বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর যারা নির্ভুল অঙ্ক করে, তাদের ফলাফল একই রকম হয়। এতে প্রমাণ হলো, সত্য হয় একটি আর মিথ্যা হয় অনেকগুলো। সুতরাং সত্য পথ হয় একটি এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে কর্মের অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটা সত্য-সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ। এই সত্য-সঠিক নির্ভুল আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন করা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। শুধু বড় প্রয়োজনই নয়-বরং মানব জীবনের প্রকৃত মৌলিক প্রয়োজন।

এর কারণ হলো, পৃথিবীর সমস্ত জিনিস তো মানুষের কেবলমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূরণ করে যা মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। পক্ষান্তরে সহজ-সরল, সত্য পথপ্রদর্শনের প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়। এই বিষয়টি যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে এর

পরিষ্কার অর্থ এটাই হয় যে, মানুষ হিসাবে তার পৃথিবীতে আগমনই ব্যর্থ হয়েছে। যে আল্লাহ্ মানুষের অস্তিত্ব দানের পূর্বে মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি মানুষের অস্তিত্ব দান করার পর জীবন ধারণ করার প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সুক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, সেই আল্লাহ্ মানুষের মানবিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আসল প্রয়োজন পূরণের তথা পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন না, এটা তো হতে পারে না।

এ জন্য বান্দাহ্ যখন দাবী পেশ করছে, 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য সহজ-সরল পথপ্রদর্শন করো, যে পথ তোমার নে'মাতে পরিপূর্ণ-সে পথ আমাদেরকে দেখাও।' তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হলো, 'আমার দাসত্ব করবে আমার আনুগত্য করবে, এটাই সেই পথ-যা তোমরা দাবী করছো।' মহান আল্লাহ রাব্বুল মানব জাতিকে এই হেদায়াত দানের লক্ষ্যেই নবুওয়াতের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা যদি আমার এই নবুওয়াত গ্রহণ না করো, তাহলে বলে দাও তোমাদের ধারণা অনুসারে তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আমি অন্য কি পদ্ধতি দান করেছি? তোমরা যদি এই প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলো যে, আমি তোমাদেরকে যে চিন্তাশক্তি দিয়েছি, তা প্রয়োগ করে তোমরা নিজেরা পথ আবিষ্কার করে তা অনুসরণ করবে। এ কথা তোমরা বলতে পারো না-কারণ তোমাদের এই মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ-মত উদ্ভাবন করেছে যে; তা সবই অসত্য, অনুসরণের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তোমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছো।

এরপর তোমরা আমার ওপর এই অভিযোগও আরোপ করতে পারো না যে, আমি তোমাদেরকে কোন পথই প্রদর্শন করিনি। কারণ, তোমরা মানুষ আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব। আমি তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের জন্য এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করে রেখেছি অথচ তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শন না করে একেবারে তিমিরাবৃত পরিবেশে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়ানোর এবং প্রতি পদে আঘাত পাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি? না, এমন করে তোমাদেরকে আমি ছেড়ে না দিয়ে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আমি আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ভেতরে জন্মগতভাবে, স্বভাবগতভাবে সত্য সঠিক পথে চলার প্রেরণা দান করেছেন। অন্যান্য সৃষ্টির মতো তিনি সত্য

পথে চলার জন্মগত প্রেরণা মানুষের ভেতরেও দান করতে পারতেন। নবী-রাসূল, নবুওয়াত-রেসালাতের কোন প্রয়োজনই তাহলে হতো না। মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সত্য পথের অনুসারী হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর সেটা আভিপ্রায় নয়। তাঁর অভিপ্রায় হলো, তিনি এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটাবেন যে, যে সৃষ্টি তার নিজের পছন্দ ও বিচার শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ভ্রান্ত-অভ্রান্ত তথা যে কোন ধরনের পথে চলার স্বাধীনতা রাখবে।

এই স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণে সজ্জিত করা হবে। বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সঙ্কল্পের শক্তি দান করা হবে। তাকে নিজের দেহের অভ্যন্তরের ও দেহের বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করা হবে। তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত দিকে এমন সব অসংখ্য অগণিত কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হবে যা তার জন্য সঠিক পথ লাভ করা ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়া-এ দুটোরই কারণ হতে পারে।

যদি মানুষকে স্বভাবগত বা জন্মগতভাবে সঠিক পথের অনুসারী করা হতো, তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছানো মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। মানুষকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই সে তার চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করে সঠিক পথে পরিচালিত করার নীতি পরিহার করে নবুওয়াত-রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুন্ন থাকবে তেমনি মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য সহজ-সরল ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া হবে। সুতরাং সত্য-সঠিক পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজে গ্রহণ করেছেন। মানুষ যখন তাঁর কাছে আবেদন জানালো সত্য পথের জন্য, তখন তাঁর সামনে গোটা কোরআন দিয়ে বলে দেয়া হলো, এই কোরআনের বিধান অনুসরণ করো। তোমরা যে হেদায়াত চাচ্ছো, এই কোরআনই হলো সেই হেদায়াত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁরই দেয়া হেদায়াত মহাগ্রন্থ আল কোরআন ও তাঁর নবীর সুন্নাত পৃথিবীর জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণ করে চলার তওফিক দান করুন। আমীন।

বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাচ্ছির
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি
কর্তৃক রচিত বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

তাফসীরে সাঈদী

সূরা ফাতিহা, সূরা আল-আসর, সূরা লুকমান, আমপারার
তাফসীরসহ আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ

১. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
২. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কোরআন
৩. আল-কোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
৪. আল-কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
৬. দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
৭. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন- ১ ও ২
৮. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৯. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
১০. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১১. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১২. শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
১৩. কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয়?
১৪. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মোনাজাত
১৬. আল্লাহ কোথায় আছেন?
১৭. আখিরাতের জীবনচিত্র
১৮. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১-২৭৬৪৭৯